তা'হলো ঃ মদীনায় আবূ আমের নামের এক ব্যক্তি জাহেল যুগে—খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং আবূ আমের 'পাদ্রী' নামে খ্যাত হলো। তার পুত্র ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত হানযালা (রা), যাঁর মরদেহকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতা নিজের গোমরাহী ও খৃস্টবাদের উপর অবিচল ছিল।

হযরত নবী করীম (সা) হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হলে আবূ আমের তাঁর সমীপে উপস্থিত হয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে। মহানবী (সা) তার অভিযোগের জবাব দান করেন। কিন্তু তাতে সেই হতভাগার সান্ত্বনা আসলো না। অধিকন্তু সে বলল, "আমরা দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন অভিশপ্ত ও আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে।" সে একথা বলল যে, আপনার যে কোন প্রতিপক্ষের সাহায্য আমি করে যাবো। সে মতে হোনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত সকল রণাঙ্গনে সে মুসলমানদের বিপরীতে অংশ নেয়। হাওয়াযিনের মত সুরূহৎ শক্তিশালী গোত্রও যখন মুসলমানদের কাছে পরাজিত হলো, তখন সে নিরাশ হয়ে সিরিয়ায় চলে গেল। কারণ, তখন এটি ছিল খৃস্টানদের কেন্দ্রস্থল। আর সেখানে সে আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। সে যে দোয়া করেছিল, তা ভোগ করলো। আসলে লান্ছনা ভোগ কারো অদৃষ্টে থাকলে সে এমনই করে এবং নিজের দোয়ায় নিজেই লান্ছিত হয়।

তবে আজীবন সে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। সে রোমান সম্রাটকে মদীনায় অভিযান চালিয়ে মুসলমানদের দেশান্তরিত করার প্ররোচণাও দিয়েছিল।

এ ষড়যন্ত্রের শুরুতে সে মদীনার পরিচিত মুনাফিকদের কাছে চিঠি লিখে যে, "রোমান সম্রাট কর্তৃক মদীনা অভিযানের চেষ্টায় আমি আছি। কিন্তু যথাসময় সম্রাটের সাহায্য হয় মত কোন সম্মিলিত শক্তি তোমার থাকা চাই। এর পন্থা হলো এই যে, তোমরা মদীনার মসজিদের নাম দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ কর, যাতে মুসলমানদের অন্তরে কোন সন্দেহ না আসে। অতপর সে গৃহে নিজেদের সংগঠিত কর এবং যতটুকু সম্ভব যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সেখানে রাখ এবং পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা গ্রহণ কর।"

তার এ পত্রের ভিত্তিতে বারজন মুনাফিক মদীনার কোবা মহল্লায়, যেখানে হুযূরে আকরাম (সা) হিজরত করে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন—তথায় অপর একটি মসজিদের ভিত্তি রাখল। ইবনে ইসহাক (র) প্রমুখ ঐতিহাসিক এ বারজনের নাম উল্লেখ করেছেন। সে যা হোক, অতপর তারা মুসলমানদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত নিল যে, স্বয়ং রসূলে করীম (সা)-এর দ্বারা এক ওয়াক্ত নামায সেখানে পড়াবে। এতে মুসলমানগণ নিশ্চিত হবে যে, পূর্বনির্মিত মসজিদের মত এটিও একটি মসজিদ।

এ সিদ্ধান্ত মতে তাদের এক প্রতিনিধিদল মহানবী (সা)-র খিদমতে হাযির হয়ে আরয করে যে, কোবার বর্তমান মসজিদটি অনেক ব্যবধানে রয়েছে। দুর্বল ও

অসুস্থ লোকদের সে পর্যন্ত যাওয়া দুষ্কর। এছাড়া মসজিদটি এত প্রশস্তও নয় যে, এলাকার সকল লোকের সংকুলান হতে পারে। তাই আমরা দুর্বল লোকদের সুবিধার্থে অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি যদি তাতে এক ওয়াক্ত নামায আদায় করেন, তবে আমরা বরকত লাভে ধন্য হব।

রসূলে করীম (সা) তখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এখন সফরের প্রস্তুতিতে আছি। ফিরে এসে নামায আদায় করব। কিন্তু তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে যখন তিনি মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন উপরোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হল। এতে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়া হল। আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর তিনি কতিপয় সাহাবীকে---যাদের মধ্যে আমের বিন সকস্ এবং হযরত হামযা (রা)-র হন্তা 'ওয়াহশী'ও উপস্থিত ছিলেন ---এ হুকুম দিয়ে পাঠালেন যে, এক্ষুণি গিয়ে মসজিদটি ধ্বংস কর এবং আগুন লাগিয়ে এসো। আদেশমতে তাঁরা গিয়ে মসজিদটি সমূলে ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আসলেন। এ সব ঘটনা তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী থেকে উদ্ধৃত করা হলো।

তফসীরে মাযহারীতে ইউসুফ বিন সালেহীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম (সা) মদীনা পৌঁছে দেখেন যে, সে মসজিদের জায়গাটি ফাঁকা পড়ে আছে। তিনি আসেম বিন আ'দীকে সেখানে গৃহ নির্মাণের অনুমতি দান করেন। তিনি বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্, যে জায়গা সম্পর্কে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, সেই অভিশপ্ত স্থানে গৃহ নির্মাণ আমার পছন্দ নয়। তবে সাবেত বিন আকরামের ভোগ-দখলে জায়গাটি দিয়ে দিন। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, সে ঘরে তারও কোন সন্তান-সন্ততি হয়নি কিংবা জীবিত থাকেনি।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সে জায়গায় মানুষ তো দূরের কথা, পাখিকুল পর্যন্ত ডিম ও বাচ্চা দেয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তাই সেই থেকে আজ পর্যন্ত মসজিদে কোবা থেকে কিছু দূরত্বে অবস্থিত সে জায়গাটি বিরান পড়ে আছে।

ঘটনার বিবরণ জানার পর এবার আয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। প্রথম আয়াতে বলা হয়ঃ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا অর্থাৎ উপরে অপরাপর মুনাফিকের আযাব ও লাঞ্ছনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আলোচ্য মুনাফিকরাও ওদের অন্তর্ভুক্ত, যারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে মসজিদের নামে গৃহ নির্মাণ করেছে।

এ আয়াতে উক্ত মসজিদ নির্মাণের তিনটি উদ্দেশ্য উল্লেখিত হয়েছে। প্রথমত, ضِرَارًا অর্থাৎ মুসলমানদের ক্ষতিসাধন। ضَرَرٌ ও ضِرَارٌ শব্দের অর্থ ক্ষতিসাধন। তবে কতিপয় অভিধান প্রণেতা এ দু'টির মধ্যে কিছু পার্থক্য রেখেছেন। তারা বলেন, ضَرَر সেই ক্ষতিকে বলা হয়, যা ক্ষতি সাধনকারীর পক্ষে হয় লাভজনক, আর তার

প্রতিপক্ষের জন্য হয় ক্ষতিকারক ; আর ضِرَارًا হলো যা ক্ষতি সাধনকারীর পক্ষেও মঙ্গলজনক হয় না। সেহেতু উক্ত মসজিদ নির্মাতাদের মঙ্গলের পরিবর্তে একই পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে, তাই আয়াতে ضِرَارًا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, تَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ অপর মসজিদ নির্মাণ দ্বারা মুসলমানদেরকে দ্বিধাবিভক্ত করা। একটি দল সে মসজিদে নামায আদায়ের জন্য পৃথক হয়ে যাবে, যার ফলে কোবার পুরাতন মসজিদের মুসল্লী হ্রাস পাবে।

তৃতীয় উদ্দেশ্য, إِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ অর্থাৎ সেখানে আল্লাহ্ ও রসূলের শত্রুদের আশ্রয় মিলবে এবং তারা বসে বসে ষড়যন্ত্র পাকাতে পারবে।

এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যে মসজিদকে কোরআন মজীদ 'মসজিদে যিরার' নামে অভিহিত করেছে এবং যাকে মহানবী (সা)-র আদেশে ধ্বংস ও ভস্ম করা হয়েছে তা মূলত মসজিদই ছিল না, নামায আদায়ের জন্য নির্মিত হয়নি বরং তার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন, যা কোরআন চিহ্নিত করে দিয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল যে, বর্তমান যুগে কোন মসজিদের মুকাবিলায় তার কাছাকাছি অন্য মসজিদ নির্মাণ করা হলে এবং এর পেছনে যদি মুসলমানদের বিভক্তকরণ ও পূর্বতন মসজিদের মুসল্লী হ্রাস প্রভৃতি অসৎ নিয়ত থাকে, তবে এতে মসজিদ নির্মাতার সওয়াব তো হবেই না, বরং বিভেদ সৃষ্টির অপরাধে সে গুনাহগার হবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও শরীয়ত মতে সে জায়গাটিকে মসজিদই বলা হবে এবং মসজিদের আদব ও হুকুমগুলো এখানেও প্রযোজ্য হবে। একে ধ্বংস করা কিংবা আগুন লাগিয়ে ভস্ম করা জায়েয হবে না। এ ধরনের মসজিদ নির্মাণ মূলত গুনাহর কাজ হলেও যারা এতে নামায আদায় করবে, তাদের নামাযকে অশুদ্ধ বলা যাবে না। এ থেকে অপর একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কেউ যদি জিদের বশে বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন মসজিদ নির্মাণ করে, তবে যদিও মসজিদ নির্মাণের সওয়াব সে পাবে না বরং গুনাহ্গার হবে; কিন্তু একে আয়াতে উল্লিখিত 'মসজিদে যিরার' বলা যাবে না। অনেকে এ ধরনের মসজিদকে 'মসজিদে যিরার' নামে অভিহিত করে থাকে। কিন্তু তা ঠিক নয়। তবে একে 'মসজিদে যিরার'-এর মত বলা যায়। তাই এর নির্মাতাকে এ প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত রাখা যেতে পারে। যেমন, হযরত উমর ফারূক (রা) এক আদেশ জারি করেছিলেন যে, এক মসজিদের পার্শ্বে অন্য মসজিদ নির্মাণ করবে না, যাতে পূর্বতন মসজিদের জামাত ও সৌন্দর্য হ্রাস পায়।—(কাশ্‌শাফ)

উপরোক্ত মসজিদে যিরার সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াতে মহানবী (সা)-কে হুকুম করা হয় যে, لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا এখানে দাঁড়ানো অর্থ নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো। অর্থাৎ আপনি এই তথাকথিত মসজিদে কখনো নামায অদায় করবেন না।

মাসআলা ঃ এ বাক্য থেকে জানা যায় যে, বর্তমানকালেও যদি কেউ পূর্বতন মসজিদের নিকটে নিছক লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বা জিদের বশে কোন মসজিদ নির্মাণ করে, তবে সেখানে নামায শুদ্ধ হলেও নামায পড়া ভাল নয়।

এ আয়াতে মহানবী (সা)-কে হিদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, আপনার নামায সে মসজিদেই দুরস্ত হবে, যার ভিত্তি রাখা হয় প্রথম দিন থেকে তাকওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতির উপর। আর সেখানে এমন লোকেরা নামায আদায় করে, যারা পাক-পবিত্রতায় পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনে উদগ্রীব। বস্তুত আল্লাহ নিজেও এমনিতর পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।

আয়াতের বর্ণনাধারা থেকে বোঝা যায় যে, সে মসজিদটি হলো মসজিদে কোবা, যেখানে মহানবী (সা) তখন নামায আদায় করতেন। হাদীসের কতিপয় রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। كما رواه ابن مردويه عن عباس وعمرو بن شيبة عن سهل الانصارى وابن خزيمة فى صحيحة عن عويمر بن ساعده ---(তফসীরে মাযহারী)

অপর কতিপয় রেওয়ায়েত মতে এর অর্থ যে মসজিদে নববী নেওয়া হয়েছে, তা' আয়াতের মর্মের পরিপন্থী নয়। কেননা, মসজিদে নববীর ভিত্তি মহানবী (সা) নিজ দস্তে মুবারকে ওহীর আদেশ মতে রেখেছিলেন। সুতরাং এর ভিত্তি যে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত, তা' বলাই বাহুল্য। কেননা তাঁর চেয়ে অধিক পবিত্র আর কে হতে পারে ? অতএব এ মসজিদটিও আয়াতের উদ্দেশ্য।---(তিরমিযী, কুরতুবী)

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا এ আয়াতে সেই মসজিদকে মহানবী (সা)-এর নামাযের অধিকতর হকদার বলে অভিহিত করা হয়, যার ভিত্তি শুরু থেকেই তাকওয়ার উপর রাখা হয়েছে। সে হিসাবে মসজিদে কোবা ও মসজিদে নববী উভয়টিই এ মর্যাদায় অভিষিক্ত। সে মসজিদেরই ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তথাকার মুসল্লিগণ পাক-পবিত্রতা অর্জনে সবিশেষ যত্নবান। পাক-পবিত্রতা বলতে এখানে সাধারণ না-পাকী ও ময়লা থেকে পাক-পরিচ্ছন্ন হওয়া এবং তৎসঙ্গে গুনাহ্‌ ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র থাকা বোঝায়। আর মসজিদে নববীর মুসল্লিগণ সাধারণত এ সব গুণেই গুণান্বিত ছিলেন।

ফায়দা ঃ উক্ত আয়াত থেকে এ কথাও বোঝা গেল যে, কোন মসজিদের মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার পূর্বশর্ত হলো, তা ইখলাসের সাথে শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে নির্মিত হওয়া এবং তাতে কোন লোক দেখানো মনোবৃত্তি ও মন্দ উদ্দেশ্যের সামান্যতম দখলও না থাকা। আর একথাও জানা গেল যে, নেক্‌কার, পরহিযগার এবং আলিম ও আবিদ মুসল্লীর গুণেও মসজিদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তাই যে মসজিদের মুসল্লিগণ আলিম, আবিদ ও পরহিযগার হবে, সে মসজিদে নামায আদায়ে অধিক ফযীলত লাভ করা যাবে।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে সেই মকবুল মসজিদের মুকাবিলায় মুনাফিকদের নির্মিত মসজিদে যিরারের নিন্দা করে বলা হয়েছে, তার তুলনা নদীর তীরবর্তী এমন মাটির সাথেই করা যায়, যাকে পানির ঢেউ নিচের দিকে সরিয়ে দেয়, কিন্তু উপর থেকে মনে হয় যেন সমতল ভূমি। এর উপর কোন গৃহ নির্মাণ করলে যেমন অচিরেই তা' ধসে যাবে, মসজিদে যিরার-এর ভিত্তিও ছিল তেমনি নড়বড়ে। সুতরাং অচিরেই সেটি ধসে গেল এবং জাহান্নামে পতিত হলো। জাহান্নামে পতিত হওয়ার কথাটি রূপক অর্থেও নেওয়া যায় এ হিসেবে যে, এর নির্মাতারা যেন জাহান্নামে পৌঁছার পথ পরিষ্কার করলো। তবে কতিপয় মুফাসসির এর আক্ষরিক অর্থও নিয়েছেন। অর্থাৎ মসজিদটিকে ধ্বংস করার পর তা' প্রকৃত প্রস্তাবেই জাহান্নামে চলে গেল। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

শেষের আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের এই নির্মাণ কর্ম সর্বদা তাদের সন্দেহ ও মুনাফেকীকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চলবে, যতক্ষণ না তাদের অন্তরগুলো ফেটে চৌচির হয়ে যায়। অর্থাৎ তাদের জীবন শেষ না হওয়া অবধি তাদের সন্দেহ, কপটতা, হিংসা ও বিদ্বেষ সমানভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ
الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ
حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ
فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ
السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ
الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

(১১১) আল্লাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে; অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআন তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহ্র চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক। সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ' হল মহান সাফল্য। (১১২) তারা তওবাকারী, ইবাদতকারী, শোকরগোযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কছেদকারী, রুকূ ও সিজদা আদায়কারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্তকারী এবং আল্লাহর দেয়া সীমাসমূহের হেফাযতকারী। বস্তুত সুসংবাদ দাও ঈমানদারদেরকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মুসলমানদের জান ও মালামালকে এ ওয়াদার বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জান্নাত লাভ হবে। (আল্লাহ্র কাছে জান-মাল বিক্রির অর্থ হল এই যে,) তারা আল্লাহর রাহে যুদ্ধ (জিহাদ) করে, এতে তারা (কখনো শত্রুকে) হত্যা করে এবং (কখনো নিজে) নিহত হয়। (অর্থাৎ এ বেচা-কেনা জিহাদের জন্য। চাই অন্যকে হত্যা করুক বা নিজে নিহত হোক।) এ (যুদ্ধ) প্রসঙ্গে (তাদের সাথে) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে; ইঞ্জিলে এবং কোরআনে (ও)। আর (একথা সর্বজনস্বীকৃত যে,) আল্লাহ্র চেয়ে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আছে? (তিনি এই লেন-দেনের ভিত্তিতে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।) সুতরাং (এ অবস্থায়) তোমরা (যে জিহাদে লিপ্ত রয়েছ) নিজেদের এই লেন-দেনের উপর (যা আল্লাহ্র সাথে হয়েছে) আনন্দ প্রকাশ কর। (কেননা প্রতিশ্রুতি মতে তোমরা অবশ্যই জান্নাত লাভ করবে।) আর এ (জান্নাত লাভই) হল মহান সাফল্য। (তাই এ বেচা-কেনা অবশ্যই তোমাদের করা উচিত।) তারা (সে মুজাহিদগণ) এমন যে, তারা জিহাদ করা ছাড়াও আরো কিছু গুণে গুণান্বিত। তা হলো এই যে, তারা গুনাহ থেকে তওবাকারী, আল্লাহ্র ইবাদতকারী, (আল্লাহ্র) প্রশংসাকারী, রোযা পালনকারী, রুকূ ও সিজদাকারী (অর্থাৎ নামায আদায়কারী,) সৎকাজের আদেশদানকারী, মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্তকারী এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমাগুলোর (অর্থাৎ হুকুম-আহকামের রক্ষণাবেক্ষণ) ব্যাপারে যত্নবান। আর আপনি এমন মু'মিনদের সুসংবাদ দান করুন (যারা জিহাদ ও এসব গুণে গুণান্বিত যে, তাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিনা ওযরে জিহাদ থেকে বিরত থাকার নিন্দা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে রয়েছে মুজাহিদগণের ফযীলতের বর্ণনা।

শানে নুযূল ঃ অধিকাংশ মুফাসসিরের ভাষ্যমতে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে 'বায়'আতে আকাবায়' অংশে গ্রহণকারী লোকদের ব্যাপারে। এ বায়'আত নেওয়া

হয়েছিল মক্কায় মদীনার আনসারদের থেকে। তাই সূরাটি মদনী হওয়া সত্ত্বেও এ আয়াতগুলোকে মক্কী বলা হয়েছে।

'আকাবা' বলা হয় পর্বতাংশকে। এখানে আকাবা বলতে বোঝায় 'মিনা'র জমরায়ে আকাবার সাথে মিলিত পর্বতাংশকে। বর্তমানে হাজীদের সংখ্যাধিক্যের দরুন পর্বতের এ অংশটিকে শুধু জমরা বাদ দিয়ে মাঠের সমান করে দেয়া হয়েছে। এখানে মদীনা থেকে আগত আনসারগণের তিন দফে বায়'আত নেওয়া হয়। প্রথম দফে নেওয়া হয় নবুয়তের একাদশ বর্ষে। তখন মোট ছয়জন লোক ইসলাম গ্রহণ করে বায়'আত নিয়ে মদীনা ফিরে যান। এতে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলাম ও নবী করীম (সা)-এর চর্চা শুরু হয়। পরবর্তী বছর হজ্জের মৌসুমে বার জন লোক সেখানে একত্রিত হন। এদের পাঁচ জন ছিলেন পূর্বের এবং সাত জন ছিলেন নতুন। তাঁরা সবাই মহানবী (সা)-র হাতে বায়'আত নেন। এর ফলে মদীনায় মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ চল্লিশ জনেরও বেশি। তারা নবী করীম (সা)-এর কাছে আবেদন জানান যে, তাঁদেরকে কোরআনের তালীম দানের উদ্দেশ্যে সেখানে কাউকে প্রেরণ করা হোক। তিনি হযরত মোসআব বিন উমাইর (রা)-কে প্রেরণ করেন, যিনি তথাকার মুসলমানদের কোরআন পড়ান ও ইসলামের তবলীগ করেন। ফলে মদীনার বিরাট অংশ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়।

অতপর নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে সত্তর জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সেখানে একত্রিত হন। এ হলো তৃতীয় ও সর্বশেষ বায়'আতে আকাবা। সাধারণত বায়'আতে আকাবা বলতে একেই বোঝানো হয়। এ বায়'আতটি ইসলামের মৌল আকীদা ও আমল, বিশেষত কাফিরদের সাথে জিহাদ এবং মহানবী (সা) হিজরত করে মদীনা গেলে তাঁর হিফাযত ও সাহায্য-সহযোগিতার জন্য নেওয়া হয়। বায়'আত গ্রহণকালে সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা) বলেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এখন অঙ্গীকার নেয়া হচ্ছে; আপনার রব কিংবা আপনার সম্পর্কে কোন শর্তারোপ করার থাকলে তা পরিষ্কার বলে দেওয়া হোক। হুযূর (সা) বলেন, আল্লাহ্র ব্যাপারে শর্তারোপ করছি যে, তোমরা সবাই তাঁরই ইবাদত করবে; তাঁকে ছাড়া কারো ইবাদত করবে না। আর আমার নিজের ব্যাপারে শর্ত হলো যে, তোমরা আমার হিফাযত করবে যেমন নিজের জান-মাল ও সন্তানদের হিফাযত কর। তাঁরা আরয করলেন, এ শর্ত দু'টি পূরণ করলে এর বিনিময়ে আমরা কি পাব? তিনি বললেন, জান্নাত! তাঁরা পুলকিত হয়ে বললেন, আমরা এর জন্য রাযী, এমন রাযী যে, নিজেদের পক্ষ থেকে এ চুক্তি রহিত করার আবেদন কোনদিনই পেশ করব না এবং রহিতকরণকে পছন্দও করব না।

বায়'আতে আকাবা'র ব্যাপারটি দৃশ্যত লেন-দেনের মত বিধায় এ সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ

اَلْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ আয়াত শুনে সর্বপ্রথম হযরত বরা বিন মা'রুর, আবুল হায়সম ও আস্‌আদ (রা) নিজেদের হাত মহানবী (সা)-র হস্ত মুবারকের উপর রেখে বললেন, এ অঙ্গীকার পালনে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আপনার হিফাযত করব নিজের পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের মত। আর আপনার বিরুদ্ধে সমগ্র দুনিয়ার সাদা-কালো সবাই সমবেত হলেও আমরা সবার সাথে যুদ্ধ করে যাব।

জিহাদের সর্বপ্রথম আয়াত ঃ মহানবী (সা)-র মক্কা শরীফে অবস্থানকালে এ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কিত কোন হুকুম নাযিল হয়নি। এটিই সর্বপ্রথম জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত, যা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। তবে এর উপর আমল শুরু হয় হিজরতের পরে। এরপর দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হয় ঃ اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ (সূরা হজ্জ ঃ ৩৯)। মক্কার কুরাইশ বংশীয় কাফিরদের অগোচরে যখন বায়'আতে আকাবা সম্পাদিত হয় আর তখনই মহানবী (সা) মক্কার মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের আদেশ দিয়ে দেন। অতপর ক্রমশ সাহাবায়ে কিরামের হিজরতের ধারা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু নবী করীম (সা) নিজে আল্লাহ্‌র অনুমতির অপেক্ষায় থাকেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হিজরতের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তাঁকে নিজের সহযাত্রী করার মানসে তখনকার মত নিবৃত্ত রাখেন।—(মাযহারী)

فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ থেকে يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, জিহাদের হুকুম পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্যও সকল কিতাবে নাযিল হয়েছিল। ইঞ্জিলে (বাইবেলে) জিহাদের হুকুম নেই বলে যে কথা প্রচলিত রয়েছে, তা সম্ভবত এজন্য যে, পরবর্তী খৃস্টানরা ইঞ্জিলের যে বিকৃতি ঘটিয়েছে তার ফলে জিহাদের হুকুম সম্বলিত আয়াতগুলো খারিজ হয়ে যায়—আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ বায়'আতে আকাবায় রসূলুল্লাহ (সা)-র সাথে যে অঙ্গীকার করা হয়, তা দৃশ্যত ক্রয়-বিক্রয়ের মত। তাই আয়াতের শুরুতে 'ক্রয়' শব্দের ব্যবহার করা হয়। উপরোক্ত বাক্যে মুসলমানদের বলা হচ্ছে যে, ক্রয়-বিক্রয়ের এই সওদা তোমাদের জন্য লাভজনক ও বরকতময়। কেননা এর দ্বারা অস্থায়ী জান-মালের বিনিময়ে স্থায়ী জান্নাত পাওয়া গেল। চিন্তা করার ব্যাপার যে, এখানে ব্যয় হলো শুধু মাল। কিন্তু আত্মা মৃত্যুর পরও বাকী থাকবে। চিন্তা করলে আরো দেখা যায় যে, মালামাল হলো আল্লাহ্‌রই দান। মানুষ শূন্য হাতেই জন্ম নেয়। অতপর আল্লাহ্ তাকে অর্থ-সম্পদের মালিক করেন এবং নিজের দেয়া সে অর্থের বিনিময়েই

বান্দাকে জান্নাত দান করবেন। তাই হযরত উমর ফারূক (রা) বলেন, "এ এক অভিনব বেচা-কেনা, মাল ও মূল্য উভয়ই তোমাদিগকে দিয়ে দিলেন আল্লাহ্।" হযরত হাসান বসরী (রা) বলেন, "লক্ষ্য কর, এ কেমন লাভজনক সওদা, যা আল্লাহ্ সকল মু'মিনের জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন।" তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ্ তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে কিছু ব্যয় করে জান্নাত ক্রয় করে নাও।"

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ ... এ গুণাবলী হলো সেসব মু'মিনের, যাদের সম্পর্কে পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে---"আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন"। আয়াতটি নাযিল হয়েছিল বায়'আতে আকাবায় অংশগ্রহণকারী একটি বিশেষ জামাত সম্পর্কে। তবে আল্লাহ্র রাহে জিহাদকারী সবাই এ আয়াতের মর্মভুক্ত। আর اَلتَّآئِبُوْنَ থেকে শেষ পর্যন্ত যে গুণাবলীর উল্লেখ হয়েছে, তা শর্তরূপে নয়। কারণ, আল্লাহ্র রাহে কেবল জিহাদের বিনিময়েই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তবে এ গুণাবলী উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, যারা জান্নাতের উপযুক্ত, তারা এ সকল গুণেরও অধিকারী হয়। বিশেষত বায়'আতে আকাবায় অংশ গ্রহণকারী সাহাবাদের এ সকল গুণ ছিল।

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে اَلسَّآئِحُوْنَ-এর অর্থ صَآئِمُوْنَ অর্থাৎ রোযা-পালনকারী। শব্দটি سَيَاحَتٌ (দেশ ভ্রমণ) থেকে উদ্ভূত। ইসলামপূর্ব যুগে খৃস্ট ধর্মে দেশ ভ্রমণকে ইবাদত মনে করা হতো। অর্থাৎ মানুষ পরিবার পরিজন ও ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াত। ইসলাম ধর্মে একে বৈরাগ্যবাদ বলে অভিহিত করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর পরিবর্তে রোযা পালনের ইবাদতকে এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ। অথচ রোযা এমন এক ইবাদত, যা পালন করতে গিয়ে যাবতীয় পার্থিব বাসনা ত্যাগ করতে হয় এবং এরই ভিত্তিতে কতিপয় রেওয়ায়েতে জিহাদকেও দেশ ভ্রমণের অনুরূপ বলা হয়। এ হাদীসটি ইবনে মাজা, হাকেম ও বায়হাকী প্রমুখ মুহাদ্দিস সহীহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হুযুরে আকরাম (সা) ইরশাদ করেছেন, "আমার উম্মতের দেশভ্রমণ سَيَاحَةُ اُمَّتِىْ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ হলো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।"

হযরত আব্দুল্লা বিন আব্বাস (রা) বলেন, কোরআন মজীদে ব্যবহৃত سَآئِحِيْنَ শব্দের অর্থ রোযাদার। হযরত ইকরিমা (রা) سَآئِحِيْنَ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন যে,

এরা হলো ইলমে দীনের শিক্ষার্থী, যারা ইলম হাসিলের জন্য ঘর-বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে পড়ে।

আলোচ্য আয়াতে মু'মিন-মুজাহিদের সাতটি গুণ, যথা ঃ تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، حَامِدُونَ، سَائِحُونَ، رَاكِعُونَ، سَاجِدُونَ، آمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ— উল্লেখ করে অষ্টম গুণ হিসাবে বলা হয়েছে الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ এতে রয়েছে উপরোক্ত সাতটি গুণের সমাবেশ। অর্থাৎ সাতটি গুণের মধ্যে যে তফসীল রয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত সার হলো এই যে, এঁরা নিজেদের প্রতিটি কর্ম ও কথায় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা তথা শরীয়তের হুকুমের অনুগত ও তার হিফাযতকারী।

আয়াতের শেষে বলা হয় وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ যে সকল মু'মিনের উপরোক্ত গুণাবলী রয়েছে, তাদের এমন নিয়ামতের সুসংবাদ দান করুন, যা ধারণার অতীত, যা ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না এবং যা এ পর্যন্ত কেউ শোনেওনি অর্থাৎ জান্নাতের নিয়ামত।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا
أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا
كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ۚ
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ
حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

(১১৩) নবী এবং মু'মিনের উচিত নয় মুশরিকদের মাগফিরাত কামনা করা, যদিও তারা আত্মীয় হোক—একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা দোযখী। (১১৪) আর ইবরাহীম কর্তৃক স্বীয় পিতার মাগফিরাত কামনা ছিল কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতপর যখন তাঁর কাছে একথা প্রকাশ পেল যে,

সে আল্লাহর শত্রু, তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন। নিঃসন্দেহে ইবরাহীম ছিলেন বড় কোমলহৃদয়, সহনশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পয়গম্বর (সা) ও অপরাপর মুসলমানের পক্ষে মুশরিকদের মাগফিরাত কামনা করা জায়েয নয় যদি সে আত্মীয়ও হয়, একথা পরিষ্কার হওয়ার পর যে, তারা দোযখী (কারণ, তারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।) আর [হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ঘটনা থেকে যদি সন্দেহ হয়, তবে তার উত্তর হলো এই যে,] ইবরাহীম (আ) কর্তৃক স্বীয় পিতার মাগফিরাত কামনা ছিল (পিতার দোযখী হওয়ার ব্যাপারটি পরিষ্কার হওয়ার আগে এবং তাও) সেই প্রতিশ্রুতির দরুন যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। (তিনি বলেছিলেন ঃ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي— মোটকথা, তাঁর মাগফিরাত কামনা জায়েয হওয়ার কারণ ছিল পিতার দোযখী হওয়ার ব্যাপারটি স্পষ্ট না হওয়া। আর সে মাগফিরাতও চেয়েছিলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন বিধায়। নতুবা মাগফিরাত কামনা জায়েয থাকলেও তিনি তা করতেন না) অতপর যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর শত্রু (অর্থাৎ কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে) তখন সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন। (এবং মাগফিরাত কামনাও পরিহার করলেন। কেননা, এমতাবস্থায় দোয়া করা নিরর্থক। কারণ, কাফিরের মাগফিরাতের আদৌ সম্ভাবনা নেই। তবে জীবিত অবস্থার কথা ভিন্ন। তখন মাগফিরাতের অর্থ হতে পারে হিদায়ত লাভের তওফীক কামনা করা। কারণ, হিদায়তের তওফীকপ্রাপ্ত হলে মাগফিরাত অবশ্যম্ভাবী হতো। আর অঙ্গীকার করার কারণ হলো) ইবরাহীম (আ) ছিলেন বড় কোমলহৃদয়, সহনশীল (তিনি পিতার অত্যাচার-উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করে গেছেন। অধিকন্তু পিতৃভক্তির দরুন মাগফিরাত কামনার অঙ্গীকার করেছেন এবং দোয়ার সুফল লাভের সম্ভাবনা তিরোহিত না হওয়া পর্যন্ত সে অঙ্গীকার পালনও করে গেছেন। কিন্তু পিতা থেকে যখন নিরাশ হয়ে পড়লেন, তখন মাগফিরাত কামনাও পরিহার করলেন। কিন্তু মুশরিকদের জন্য তোমাদের যে মাগফিরাত কামনা, তা হল তাদের মৃত্যুর পর। অথচ জানা কথা যে, শিরক অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। তাই ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনার সাথে একে তুলনা করা ঠিক নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গোটা সূরা তওবাই কাফির ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার হুকুম-আহ্কাম সম্বলিত। সূরাটি শুরু হয় بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ বাক্য দিয়ে। এজন্য এটি সূরা 'বরাআত' নামেও খ্যাত। এ পর্যন্ত যতগুলো হুকুম বর্ণিত হয়েছে তা ছিল

পার্থিব জীবনে কাফির ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ সম্পর্কিত। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত সম্পর্কচ্ছেদের হুকুম হলো পরজীবন সংক্রান্ত। তা হল এই যে, মৃত্যুর পর কাফির ও মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনাও জায়েয নেই। যেমন, পূর্ববর্তী এক আয়াতে নবী করীম (সা)-কে মুনাফিকদের জানাযার নামায পড়তে বারণ করা হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত অবতরণের পটভূমি হলো, হুযুরে আকরাম (সা)-এর চাচা আবূ তালিব যদিও ইসলাম গ্রহণ করেন নি, তথাপি তিনি আজীবন ভ্রাতুষ্পুত্রের হিফাযত ও সাহায্যকারী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে স্বগোত্রের কারো এতটুকু তোয়াক্কা করেন নি। এজন্য মহানবী (সা) তার দ্বারা অন্তত কলেমাটি পাঠ করিয়ে নেবার চেষ্টায় ছিলেন। কারণ, ঈমান আনলে রোজ হাশরে সুপারিশ করার একটা সুযোগ হবে এবং দোযখের আযাব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। অতপর চাচা যখন মৃত্যুশয্যায় জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত, তখন তাঁর চেষ্টা ছিল যদি শেষ মুহূর্তেও কোন উপায়ে কলেমাটি পাঠ করিয়ে নেওয়া যায়, তবে একটা সদগতি হয়। তাই তিনি চাচার শয্যাপাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু দেখলেন, আবূ জাহল ও আবদুলাহ্ বিন উমাইয়া পূর্ব থেকেই সেখানে উপস্থিত। তবুও তিনি বললেন, চাচাজান, কলেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করুন। আমি আপনার মাগফিরাতের জন্য চেষ্টা করবো। তখন আবূ জাহ্ল বলে উঠল, আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবেন? রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের কথাটি আ'রা কয়েকবার বলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই আবূ জাহ্ল নিজের বক্তব্য পেশ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আবূ তালিব একথা বলেই মৃত্যুবরণ করে যে, "আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর আছি।" পরে রসূলে করীম (সা) শপথ করে বলেন, কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা না আসা পর্যন্ত আমি তোমার জন্য নিয়মিত মাগফিরাত কামনা করবো। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। এ আয়াতে রসূলে করীম (সা) ও সকল মুসলমানকে কাফির ও মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে বারণ করা হয়েছে ---যদিও তারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়।

এতে কোন কোন মুসলমানের মনে প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে ইবরাহীম (আ) নিজের কাফির পিতার জন্য দু'আ করেছিলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ পরবর্তী আয়াতটি নাযিল হয়ঃ مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) পিতার জন্য যে দু'আ করেছিলেন, তা ছিল এ কারণে যে, পিতা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কুফরের উপর যে অটল থাকবে এবং কুফরী অবস্থায়ই যে মৃত্যুবরণ করবে, সেকথা তাঁর জানা ছিল না। তাই তিনি বলেছিলেন, আমি আপনার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করবো--- سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে,

তাঁর পিতা আল্লাহ্‌র শত্রু অর্থাৎ কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তখন তিনিও সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন এবং মাগফিরাতের দু'আও ত্যাগ করেন।

কোরআনে যে সকল আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক স্বীয় পিতার জন্য দু'আ করার উল্লেখ রয়েছে, তা' সবই ছিল উপরোক্ত কারণের প্রেক্ষিতে অর্থাৎ তাঁর দু'আর উদ্দেশ্য ছিল যাতে পিতা ঈমান ও ইসলামের তওফীক লাভ করে, এবং তাতে তাঁর মাগফিরাত হতে পারে।

ওহুদ যুদ্ধে যখন কাফিররা মহানবী (সা)-র চেহারা মুবারকে আঘাত করে তখন তিনি নিজ হাতে গণ্ডদেশের রক্ত মুছতে মুছতে দু'আ করেছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ اِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্‌, আমার জাতিকে ক্ষমা কর, তারা অবুঝ। কাফিরদের জন্য মহানবী (সা)-র উক্ত দু'আর উদ্দেশ্য হলো, তাদের যেন ঈমান ও ইসলামের তওফীক লাভ হয় এবং তার ফলে যেন তারা মাগফিরাতের যোগ্য হয়।

ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, এ আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, জীবিত কাফিরের জন্য ঈমানের তওফীক লাভের নিয়তে দু'আ করা জায়েয রয়েছে, যাতে সে মাগফিরাতের যোগ্য হতে পারে। اَوَّاهٌ ـ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লামা কুরতুবী (র)-র ১৫টি অর্থ উল্লেখ করেছেন, তবে সবই সমার্থবোধক। প্রকৃতপক্ষে তাতে তেমন ব্যবধান নেই। তন্মধ্যে কয়েকটি অর্থ এই ---অতিশয় হা-হুতাশকারী, অত্যধিক প্রার্থনাকারী, মানুষের প্রতি দয়াশীল। হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন মসউদ (রা) থেকে শেষোক্ত অর্থ বর্ণিত রয়েছে।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۭ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۭ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

(১১৫) আর আল্লাহ্‌ কোন জাতিকে হিদায়ত করার পর পথভ্রষ্ট করেন না ---যতক্ষণ না তাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বলে দেন সেসব বিষয় যা' থেকে তাদের বেঁচে থাকা দরকার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল। (১১৬) নিশ্চয় আল্লাহ্‌রই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের সাম্রাজ্য। তিনিই জিন্দা করেন ও মৃত্যু ঘটান, আর আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমাদের জন্য কোন সহায়ও নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আল্লাহ্ এমন নন যে, কোন জাতিকে হিদায়ত দান করার পর গোমরাহ করবেন, যতক্ষণ না পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করে দেন, যা থেকে তাদের বাঁচতে হবে। [(অতএব) আমি যখন তোমাদের (মুসলমানদের) হিদায়ত করেছি এবং এর পূর্বাহ্নে মুশরিকদের জন্য আগফিরাত কামনার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিনি, তখন এজন্য তোমাদের এমন সাজা দেওয়া হবে না, যাতে তোমাদের মধ্যে গোমরাহী সংক্রামিত হতে পারে।] নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবগত। (তাই এ বিষয়েও তিনি অবগত যে, তাঁর বলা ছাড়া এমন হুকুম-আহকাম কেউ জানতে পারবে না। অতএব, এ সকল কাজের ক্ষতিকর দিক তোমাদের স্পর্শ করতে দেবেন না। আর) নিঃসন্দেহে আসমানসমূহ ও যমীনে আল্লাহ্রই সাম্রাজ্য বিদ্যমান। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। (অর্থাৎ সমস্ত কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব একমাত্র তাঁরই। তাই তিনি যেমন ইচ্ছা আদেশ করেন এবং যে অনিষ্ট থেকে বাঁচাবার ইচ্ছা বাঁচান।) আর আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের না কোন সহায়ক আছে, আর না কোন সাহায্যকারী। (তিনিই সহায়ক। কাজেই নিষেধাজ্ঞার আগে অনিষ্ট থেকে তোমাদের বাঁচান। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার পর তা তোমারা মান্য না করলে তোমাদের জন্য সাহায্যকারী আর কেউ নেই।)

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ
سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ
عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ۭ
حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ
اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ۭ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ
لِيَتُوْبُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا
اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

(১১৭) আল্লাহ্ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়। (১১৮) এবং অপর তিন জনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের

জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই—অতপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি, যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ দয়াময় করুণাশীল। (১১৯) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ পয়গম্বর (সা)-এর অবস্থার প্রতি শুভদৃষ্টি রেখেছেন (যে, তাঁকে নবুয়ত, জিহাদের নেতৃত্ব ও অপরাপর গুণাবলী দান করেছেন) এবং মুহাজির ও আনসারের প্রতি (দৃষ্টি রেখেছেন যে, এমন কঠিন যুদ্ধেও তাদের সুদৃঢ় রেখেছেন) যারা এমন সংকটকালে নবীর অনুগামী হয়েছেন যখন তাদের এক দলের অন্তর বিচলিত হয়ে উঠেছিল (এবং যুদ্ধে গমনের সাহস প্রায় হারিয়ে বসেছিল)। অতপর আল্লাহ এই দলের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, (সাহস যোগান। ফলে তারাও জিহাদে শরীক হন।) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সকলের প্রতি দয়াবান ও অতিশয় করুণাময়। (অবস্থানুসারে প্রত্যেকের প্রতি দয়ার দৃষ্টি রেখেছেন।) আর অপর তিন জনের প্রতিও (দয়ার দৃষ্টি রেখেছেন) যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল—এমনকি (তাদের দুরবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে,) পৃথিবী (এত) বিশাল হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল এবং তারা নিজেদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলো, আর বুঝতে পারল যে, আল্লাহ্ (-র ধরপাকড়) থেকে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যাবে না তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া। (এ সময় তারা বিশেষ দৃষ্টি লাভের উপযুক্ত হয়।) তিনি তাদের অবস্থার প্রতি (বিশেষ) দৃষ্টিপাত করেন, যাতে তারা ভবিষ্যতেও (এমন বিপদ ও নাফরমানীকালে আল্লাহর দিকে) প্রত্যাবর্তনকারী হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই দয়ালু, করুণাময়। হে ঈমানদারগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং (কাজ-কর্মে) সত্যবাদীদের সাথে থাক (অর্থাৎ যারা নিয়ত ও কথায় সৎ তাদের পথে চল, যাতে তোমরাও সততা অবলম্বন করতে পার)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াত وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছিল যে, তাবুক যুদ্ধের আদেশ ঘোষিত হলে মদীনাবাসীরা পাঁচ দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দু'দল ছিল মুনাফিকের, যাদের বর্ণনা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সবিস্তারে এসেছে। আলোচ্য আয়াত-সমূহে রয়েছে নিষ্ঠাবান মু'মিনের তিনটি দলের বর্ণনা। প্রথম দল ছিল তাদের, যারা যুদ্ধের আদেশ হওয়া মাত্র প্রস্তুত হয়ে দিয়েছিল। তাদের আলোচনা রয়েছে প্রথম আয়াতের اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ বাক্যে। দ্বিতীয় দল যারা প্রথম দিকে

রয়েছে অত্র আয়াতের مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ বাক্যে।

তৃতীয় দল হলো তাদের, যারা সাময়িক অলসতার দরুন জিহাদ থেকে বিরত থাকে, কিন্তু পরে অনুতাপ ও অনুশোচনার সাথে তওবা করে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত তাদের তওবা কবূলও হয়। কিন্তু পরে তারা আবার দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। সর্ব সাকুল্যে তাদের সংখ্যা ছিল দশজন। তাদের সাত জন জিহাদ থেকে রসূলে করীম (সা)-এর প্রত্যাবর্তনের পর নিজেদের মনস্তাপ ও তওবাকে এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, তাঁরা মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে নিজেদের বেঁধে নেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, তওবা কবূল না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই থাকবেন। তখনই তাদের তওবা কবূল হওয়া সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়, যার বিবরণ ইতিপূর্বে এসেছে। তাঁদের বাকী তিন জন নিজেদের মনস্তাপ সেভাবে প্রকাশ করেন নি। রসূলে করীম (সা) তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ও সালামের আদান-প্রদান থেকে বিরত থাকার আদেশ দান করেন। ফলে তাঁরা ভীষণভাবে চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়েন। আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতের শুরুতে وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا বাক্যে তাঁদের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং অবশেষে তাঁদের তওবা কবূল হওয়ার বিষয়ও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে তাঁদের সমাজচ্যুত করার হুকুম রহিত হয়ে যায়। বলা হয়ঃ

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তওবা কবূল করেছেন নবীর এবং সেসব মুহাজির ও আনসারগণের যাঁরা একান্ত সংকটকালে নবীর অনুগমন করেছে।

প্রশ্ন আসে, তওবা করতে হয় পাপাচার ও নাফরমানীর কারণে। অথচ রসূলে করীম (সা) হলেন নিষ্পাপ; তাঁর তওবা কবূলের অর্থ কি? এছাড়া মুহাজির ও আনসার-গণের মধ্যে যাঁরা শুরুতেই জিহাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাঁদের তো কোন দোষ ছিল না। এ সত্ত্বেও তাঁদের তওবা কোন্ অপরাধে ছিল ---যা কবূল হয়?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, আল্লাহ্ গোনাহ থেকে তাঁদের রক্ষা করেছেন, যাকে তওবা নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিংবা এর অর্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহ্ তাঁদেরকে তওবাকারীতে পরিণত করেছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোন মানুষ তওবার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পারে না, তা স্বয়ং রসূলে করীম (সা)

কিংবা তাঁর বিশিষ্ট সাহাবা যেই হোন না কেন? যেমন, অপর আয়াতে আছে। تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا "তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর।" এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর নৈকট্যের অনেকগুলো স্তর রয়েছে। যে যেখানেই পৌঁছাক না কেন, তারপরেও অন্য স্তর থেকে যায়। তাই বর্তমান স্তরে স্থির থাকা অলসতার নামান্তর। মাওলানা রুমী (র) বিষয়টিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

اے برادر بے نہایت درگہیست
ہرچہ بروئے می رسی بروئے مایست

অর্থাৎ "হে আমার ভাই, আল্লাহর দরবার বহু উচ্চে, তাই যেখানে পৌঁছাবে, সেখানেই স্থির হয়ে থেকো না।" অতএব আল্লাহর মা'রেফতে বর্তমান স্তরে থেকে যাওয়া হতে তওবার আবশ্যক আছে, যাতে পরবর্তী স্তরে পৌঁছা যায়। سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ঃ কোরআন মজীদ জিহাদের এ মুহূর্তকে সংকটময় মুহূর্ত বলে অভিহিত করেছে। কারণ সেসময় মুসলমানগণ বড় অভাব অনটনে ছিলেন। হযরত হাসান বসরী (র) সে অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, সে সময় দশ জনের জন্য ছিল একটি মাত্র বাহন, যার উপর পালাবদল করে তাঁরা আরোহণ করতেন। তদুপরি সফরের সম্বলও ছিল নিতান্ত অপ্রতুল। অন্যদিকে ছিল গ্রীষ্ম কাল, পানিও ছিল পথের মাত্র কয়েকটি স্থানে এবং তাও অতি অল্প পরিমাণে।

مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ আয়াতের এ বাক্যে যে কিছু লোকের অন্তরের বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ ধর্মান্তর নয়, বরং এর অর্থ হলো, কড়া গ্রীষ্ম ও সম্বলের স্বল্পতা হেতু সাহস হারিয়ে ফেলা এবং জিহাদ থেকে গা বাঁচিয়ে চলা। হাদীসের রেওয়ায়েতগুলোও এ অর্থেরই সমর্থক। এই ছিল তাঁদের অপরাধ, যেজন্য তাঁরা তওবা করেন এবং তা কবুল হয়।

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا এখানে خُلِّفُوا অর্থ যাদের পেছনে রাখা হয়েছে। তবে মর্মার্থ হলো, যাঁদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হল। এঁরা তিনজন হলেন হযরত কা'আব বিন মালেক, শা-এর মুরারা বিন রবি এবং হেলাল বিন উমাইয়া (রা), তাঁরা তিনজনই ছিলেন আনসারের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। যাঁরা ইতিপূর্বে বায়'আতে আ'কাবা ও মহানবী (সা)-র সাথে বিভিন্ন জিহাদে শরীক হয়েছিলেন। কিন্তু এসময় ঘটনাচক্রে তাঁদের বিচ্যুতি ঘটে যায়। অন্যদিকে যে মুনাফিকরা কপটতার দরুন এ যুদ্ধে শরীক হয়নি, তারা তাঁদের কুপরামর্শ দিয়ে দুর্বল করে তুললো। অতপর

যখন হুযুরে আকরাম (সা) জিহাদ থেকে ফিরে আসলেন, তখন মুনাফিকরা নানা অজুহাত দেখিয়ে ও মিথ্যা শপথ করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাইল আর মহানবী (সা)-ও তাদের গোপন অবস্থাকে আল্লাহর সোপর্দ করে তাদের মিথ্যা শপথেই আশ্বস্ত হলেন। ফলে তারা দিব্যি আরামে সময় অতিবাহিত করে চলে আর ঐ তিন বুযুর্গ সাহাবীকে পরামর্শ দিতে লাগল যে, আপনারাও মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে হুযুর (সা)-কে আশ্বস্ত করুন। কিন্তু তাঁদের বিবেক সায় দিল না। কারণ প্রথম অপরাধ ছিল জিহাদ থেকে বিরত থাকা, দ্বিতীয় অপরাধ আল্লাহর নবীর সামনে মিথ্যা বলা, যা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তাঁরা পরিষ্কার ভাষায় নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন, যে অপরাধের সাজাস্বরূপ তাদের সমাজচ্যুতির আদেশ দেওয়া হয়। আর এদিকে কোরআন মজীদ সকল গোপন রহস্য উদঘাটন এবং মিথ্যা শপথ করে অজুহাত সৃষ্টিকারীদের প্রকৃত অবস্থাও ফাঁস করে দেয়। অত্র সূরার ৯৪ থেকে ৯৮ আয়াত يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ -- পর্যন্ত রয়েছে এদের অবস্থা ও নির্মম পরিণতির বর্ণনা।

কিন্তু যে তিনজন সাহাবী মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে অপরাধ স্বীকার করেছেন, অত্র আয়াতটি নাযিল হয় তাঁদের তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে। ফলে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন এহেন দুর্বিষহ অবস্থা ভোগের পর তারা আবার আনন্দিত মনে রসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের সাথে মিলিত হন।

সহী হাদীসের আলোকে ঘটনার বিবরণ

বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে হযরত কা'আব বিন মালিক (রা)-এর এ ঘটনার এক দীর্ঘ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, যা বহু ফায়দা ও মাসায়েল সম্বলিত এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সে জন্য পুরা হাদীসের তরজমা এখানে পেশ করা সমীচীন মনে করছি। সে বিদগ্ধ তিন শ্রদ্ধেয়জনের একজন ছিলেন কা'আব বিন মালিক (রা)। তিনি ঘটনার নিম্ন বিবরণ পেশ করেন ঃ

"রসূলে করীম (সা) যতগুলো যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, একমাত্র তাবুক যুদ্ধ ছাড়া বাকী সবগুলোতেই আমি তাঁর সাথে যোগদান করি। তবে বদর যুদ্ধ যেহেতু আকস্মিক-ভাবে সংঘটিত হয় এবং এতে যোগ না দেওয়ায় কেউ হযরত (সা)-এর বিরাগভাজন হয়নি তাই এযুদ্ধেও আমি শরীক হতে পারিনি। অবশ্য আমি বায়'আতে আকাবার রাতে সেখানেও উপস্থিত ছিলাম এবং আমরা ইসলামের সাহায্য ও হিফাযতের অঙ্গীকার করেছিলাম। বদর যুদ্ধের খ্যাতি যদিও সর্বত্র, তথাপি বায়'আতে আকাবার মর্যাদা আমার কাছে অধিক। তবে তাবুক যুদ্ধে শরীক না হওয়ার কারণ হলো এই যে, তখনকার মত এত প্রাচুর্য ও সচ্ছলতা পরবর্তী কোন কালেই আমার ছিল না।--- আল্লাহর কসম করে বলছি, বর্তমানের মত দু'টি বাহন ইতিপূর্বে কখনো একত্রে আমার ছিল না।

"যুদ্ধের ব্যাপারে হুযূরে আকরাম (সা)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, মদীনা থেকে বের হবার সময় গোপনীয়তা রক্ষার জন্য তিনি রণাঙ্গনে বিপরীত দিকে যাত্রা শুরু করতেন, যাতে মুনাফিক গুপ্তচরেরা সঠিক গন্তব্য সম্পর্কে শত্রুপক্ষকে হুঁশিয়ার করতে না পারে। আর প্রায়ই তিনি বলতেন, যুদ্ধে (এ ধরনের) ধোঁকা জায়েয আছে।

"এমতাবস্থায় তাবুক যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। (এ যুদ্ধটি কয়েকটি কারণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত) মহানবী (সা) প্রকট গ্রীষ্ম ও দারুণ অভাব-অনটের মধ্যে এ যুদ্ধের সংকল্প গ্রহণ করেন। সফরও ছিল বহু দূরের। শত্রুসেনার সংখ্যা ছিল বহুগুণ বেশি। তাই তিনি যুদ্ধের ব্যাপক ও সাধারণ ঘোষণা দিলেন যাতে মুসলমানরা যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারে।"

মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতমতে এ জিহাদে যোগদানকারী মুসলমানের সংখ্যা ছিল দশ হাজারেরও বেশি। আর হাকেম কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েতে হযরত মু'আয (রা) বলেন, 'নবী করীম (সা)-এর সাথে এ যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার সময় আমাদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজারেরও বেশি।'

"এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কোন তালিকা প্রস্তুত করা হয়নি। ফলে জিহাদে যেতে যারা অনিচ্ছুক, তাদের এ সুযোগ হলো যে, তাদের অনুপস্থিতির কথা কেউ জানবে না। যখন রসূলে করীম (সা) জিহাদে রওয়ানা হলেন, তখন ছিল খেজুর পাকার মওসুম। তাই খেজুর বাগানের মালিকেরা এ নিয়ে মহাব্যস্ত ছিল। ঠিক এ সময় নবী করীম (সা) ও সাধারণ মুসলমানগণ এ যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেন। বৃহস্পতিবার তিনি যুদ্ধে যাত্রা করেন। যেকোন দিকের সফরে তা যুদ্ধের হোক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার দিনটিকেই মহানবী (সা) পছন্দ করতেন।

"এদিকে আমার অবস্থা ছিল এই যে, প্রতিদিন সকালে জিহাদের প্রস্তুতির ইচ্ছা পোষণ করতাম, কিন্তু কোনরূপ প্রস্তুতি ছাড়াই ঘরে ফিরে আসতাম। মনে মনে বলতাম জিহাদের সামর্থ্য আমার আছে, বের হয়ে পড়াই আবশ্যক। কিন্তু 'আজ, না কালে'র চক্করে পড়ে থাকলাম। এমতাবস্থায় নবী করীম (সা) ও অপরাপর মুসলমানগণ জিহাদের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তবুও মনে আসতো, এক্ষুণি রওয়ানা হয়ে যাই, পরে কোনখানে তাঁদের সাথে মিলিত হব। হায়! যদি তাই করতাম, কতইনা ভাল হত! কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া আর হলো না।

"রসূলে করীম (সা)-এর জিহাদে চলে যাওয়ার পর মদীনার যেকোন পথে চলতে গিয়ে একটি কথা আমাকে পীড়া দিত। আমি দেখতাম, মদীনায় রয়েছে মুনাফিক, সফরের অযোগ্য অসুস্থ কিংবা মা'যুর লোকেরা। অপরদিকে চলার পথে মহানবী কখনো আমাকে স্মরণ করেন নি, অবশেষে তাবুক পৌঁছে তিনি বললেন, কা'আব বিন মালিকের কি হলো? (সে কোথায়?)

"উত্তরে বনু সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি জানালেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্ উত্তম পোশাক ও তৎপ্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার দরুন জিহাদ থেকে নিরত রয়েছে।' হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা) ওকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুমি মন্দ কথা বললে। ইয়া রসূলাল্লাহ তার মাঝে ভাল ব্যতীত আমি আর কিছুই পাইনি।' এ কথা শুনে নবী করীম (সা) নীরব হয়ে গেলেন।"

হযরত কা'আব (রা) বলেন, "যখন শুনতে পেলাম যে, হুযূরে আকরাম (সা) জিহাদ শেষে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তখন বড়ই চিন্তিত হয়ে পরলাম এবং তাঁর বিরাগ-ভাজন না হওয়ার জন্য যুদ্ধে না যাওয়ার কোন একটি বাহানা দাঁড় করবার ইচ্ছাও করছিলাম এবং প্রয়োজনবোধে বন্ধুদের সাহায্যও নিতাম। কিন্তু (এ জল্পনা-কল্পনায় কিছু সময় অতিবাহিত করার পর) যখন শুনলাম, নবী করীম (সা) মদীনায় ফিরে এসেছেন, তখন মনের জল্পনা-কল্পনা সব তিরোহিত হয়ে গেল। আমি উপলব্ধি করলাম যে, কোন মিথ্যা বাহানার আশ্রয় নিয়েই হযরত (সা)-এর রোষানল থেকে বাঁচা যাবে না। তাই সত্য বলার সংকল্প গ্রহণ করি। কারণ, সত্য কখন আমাকে বাঁচাতে পারে।

"সূর্য কিছু উপরে উঠলে হুযূরে আকরাম (সা) মদীনায় প্রবেশ করেন। ঠিক এমনি সময় যেকোন সফর থেকে ফিরে আসা ছিল তাঁর অভ্যাস। আরেকটি অভ্যাস ছিল এই যে, কোনখান থেকে ফিরে আসার পর প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকআত নামায আদায় করতেন। অতপর হযরত ফাতেমা (রা)-এর সাথে দেখা করতে যেতেন। তারপর স্ত্রীগণের সাথে সাক্ষাত করতেন।

"এ অভ্যাস মতে তিনি প্রথমে মসজিদে গমন করেন এবং দু'রাকআত নামায আদায় করেন, অতপর মসজিদেই বসে পড়েন। যখন যুদ্ধে যেতে অনিচ্ছুক মুনাফিকের দল---যাদের সংখ্যা ছিল আশিজনের কিছু অধিক---হুযূর (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে মিথ্যা বাহানা গড়ে, মিথ্যা শপথ করতে থাকে। রসূলে করীম (সা) তাদের এই বাহ্যিক অজুহাত ও মৌখিক শপথকে কবূল করে নিয়ে তাদের বায়'আত গ্রহণ করেন। তাদের জন্য দোয়া করেন এবং তাদের গোপন বিষয়কে আল্লাহ্র হাতে সমর্পণ করেন।

"ঠিক এ সময় আমিও তাঁর খিদমতে হাযির হই এবং তাঁর সামনে গিয়ে বসে পড়ি। আমি যখন তাঁকে সালাম দেই, তখন তিনি এমন ভঙ্গিতে একটু হাসলেন যেমন অসন্তুষ্ট লোকেরা হাসে।" কতিপয় রেওয়ায়েতমতে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন কেন? আল্লাহ্র কসম আমি মুনাফেকী করিনি। আমার মনে দীনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই এবং দীনের মধ্যে কোন পরিবর্তনও আনিনি। এবার তিনি বললেন, তা'হলে জিহাদে গেলে না কেন? তুমি কি সওয়ারী খরিদ করনি?

"আরয করলাম, অবশ্যই, ইয়া রসূলাল্লাহ্ দুনিয়ার আর কোন মানুষের সামনে যদি বসতাম, তবে নিশ্চয় কোন অজুহাত দাঁড় করিয়ে বিরাগভাজন হওয়া থেকে বাঁচতাম। কেননা বাহানা গড়ার ব্যাপারে আমি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু আল্লাহ্র কসম। আমার বুঝতে বাকি নেই যে, কোন মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে হয়ত আপনার সাময়িক সন্তুষ্টি লাভ করতে পারব, কিন্তু বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ্ আমার প্রকৃত অবস্থার কথা আপনাকে জানিয়ে দিয়ে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেবেন। আর যদি আমি সত্য কথা বলি, তবে আপনি সাময়িকভাবে অসন্তুষ্ট হলেও আশা করি আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করবেন। সুতরাং সত্য কথা হলো এই যে, জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকার যথার্থ কোন ওযর আমার ছিল না এবং এমনকি সে সময় যে আর্থিক ও শারীরিক শক্তি সামর্থ্য আমার ছিল, তা' অন্য কোন সময় ছিল না।

"রসূলে করীম (সা) বললেন, এ সত্য কথা বলেছে। অতপর বললেন, এখন যাও, দেখি আল্লাহ্ তোমার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমি চলে আসলাম। চলার পথে বনু সালমার কিছু লোক আমাকে বলল, 'আমাদের জানামতে ইতিপূর্বে তুমি কোন অপরাধ করনি। এ কেমন নির্বুদ্ধিতা? অন্যান্য লোকের মত তুমিও তো কোন একটি বাহানা গড়ে নিলে পারতে এবং তোমার অপরাধের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা) মাগফিরাত কামনা করলে যথেষ্ট হতো।' আল্লাহ্র কসম তারা আমার এই সত্যবাদিতার বারংবার নিন্দা করেছে। এমনকি আমারও মনে হয়েছে, আবার গিয়ে নবী করীম (সা)-কে বলে আসি যে, আমার পূর্ব বক্তব্য মিথ্যা; আমার যথার্থ ওযর রয়েছে।

"কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে বলেছি, অপরাধের উপর অপরাধ কেন করব? এক অপরাধ করেছি জিহাদে না গিয়ে। দ্বিতীয় অপরাধ হবে মিথ্যা কথা বলে। কাজেই আমি তাদের বললাম, আমার মত আর কি কেউ আছে, যারা নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে? তারা বলল, হ্যাঁ দু'জন আরো আছে; একজন মুরারা বিন রবি আল আমেরী অপরজন হেলাল বিন উমাইয়া ওয়াকেফী।"

ইবনে আবী হাতেম (র)-এর রেওয়ায়েতমতে হযরত মুরারা (রা)-র জিহাদ থেকে বিরত থাকার কারণ ছিল এই যে, তাঁর বাগানের ফল তখন পাকছিল। মনে মনে ভাবলেন, ইতিপূর্বে অনেক জিহাদেই তো শরীক হয়েছি। এ বছর বিরত থাকলে কি আর হবে? কিন্তু পরে যখন নিজের অপরাধ বুঝতে পারলেন, তখন আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার করে বললেন, এই বাগান আল্লাহ্র রাহে সদকা করে দিলাম।

হযরত হেলাল বিন উমাইয়া (রা)-র ব্যাপার ছিল এই যে, তাঁর পরিবারবর্গ ছিল দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্ন। এ সময় তাঁরা পরস্পর মিলিত হন। তখন তিনি চিন্তা করলেন, এ বছর জিহাদ থেকে বিরত থেকে পরিবার-পরিজনের সাথে কাটিয়ে নিই। কিন্তু পরে যখন অপরাধ বুঝতে পারলেন, তখন প্রতিজ্ঞা করলেন, এখন থেকে পরিবারবর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবো।

হযরত কা'আব বিন মালিক (রা) বলেন, "লোকেরা এমন দু'জন সম্মানী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করল, যাঁরা বদর যুদ্ধের মুজাহিদ। তাই আমি একথা বলে তাদের ত্যাগ করলাম যে, এ দু'জন শ্রদ্ধেয়জনের আমলই আমার অনুসরণীয়।

"এদিকে রসূলে করীম (সা) সাহাবায়ে কিরামকে আমাদের তিনজনের সাথে সালাম-কালাম বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে দিলেন। অথচ, পূর্বের মতই আমাদের অন্তরে মুসলমানদের ভালবাসা ছিল। কিন্তু তারা সবাই আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

"ইবনে আবি শায়বার রেওয়ায়েতে আছে---এখন আমাদের অবস্থা এমন হলো যে, আমরা লোকদের কাছে যেতাম, কিন্তু কেউ আমাদের সাথে না কথা বলতো, না সালাম দিত, আর না সালামের জবাব দিত।"

মসনাদে আবদুর রাযযাকে বর্ণিত আছে, কা'আব বিন মালিক (রা) বলেন 'তখন দুনিয়াই যেন আমাদের জন্য বদলে গেল। মনে হচ্ছিল যেন এক অচেনা জগতে বাস করছি। নিজের ঘর-বাড়ী, উদ্যান, পরিচিত লোকজন বলতে কিছুই যেন আমাদের নেই। সর্বাধিক চিন্তার বিষয় হল যে, এ অবস্থায় যদি মৃত্যুবরণ করি তবে নবী করীম (সা) আমার জানাযায় নামায আদায় করবেন না। কিংবা আল্লাহ্ না করুন যদি ইতিমধ্যে হযরত (স)-এর ইন্তেকাল হয়ে যায়, তবে সারা জীবন এ লাঞ্ছনার মধ্যেই ঘুরে ফিরতে হবে। এ চিন্তায় আমি বড় কাহিল হয়ে পড়লাম। এমনি অবস্থায় আমাদের পঞ্চাশ রাত কেটে গেল। আমার অপর দু'সঙ্গী (মুরারা ও হেলাল) এ অবস্থায় গৃহাভ্যন্তরে ঘরে বসে দিবা-রাত্রি কান্না-কাটিতে মত্ত থাকে। তবে আমি ছিলাম যুবক, বাইরে ঘুরাফেরা করতাম, নামাযের জমাআতে শরীক হতাম এবং বাজারেও যেতাম, কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতো না, সালামের জওয়াব দিত না। নামাযের পর হুযুর (সা)-এর মজলিসে বসতাম এবং সালাম দিয়ে দেখতাম জবাবে তাঁর ওষ্ঠদ্বয় নড়ছে কিনা। অতপর তাঁর পাশেই নামায আদায় করতাম এবং আড় চোখে তাঁকে দেখতাম, যখন আমি নামাযে মশগুল তখন তিনি আমার প্রতি সময় সময় দৃষ্টি রাখতেন, কিন্তু আমি তাঁর দিকে তাকালে চোখ ফিরিয়ে নিতেন।

"মুসলমানদের এই বয়কট দীর্ঘতর হয়ে উঠলে একদিন চাচাত ভাই কাতাদাহ্ (রা)-এর কাছে যাই. তিনি ছিলেন আমার বড় আপনজন। আমি তাঁর বাগানের দেয়াল টপকিয়ে ভেতরে প্রবেশ করি এবং তাঁকে সালাম দেই। আল্লাহর কসম, তিনি সালামের উত্তর দিলেন না। বললাম, কাতাদাহ্ তোমার কি জানা নেই, আমি নবী করীম (সা)-কে কত ভালবাসি? কাতাদাহ্ তখনো নিশ্চুপ। কথাটি আরো কয়েকবার বললাম, অবশেষে তৃতীয় কি চতুর্থবারে তিনি শুধু এতটুকু বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম আর দেয়াল টপকে বাইরে চলে এলাম। একদিন মদীনার বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম হঠাৎ সিরিয়া থেকে আগত জনৈক ব্যবসায়ীর প্রতি আমার নজর পড়ল। সে লোকদের জিজ্ঞেস করছিল, কা'আব ইবনে মালিকের ঠিকানা কেউ দিতে পার? লোকেরা আমার দিকে ইশারা করলে সে আমার

কাছে এসে গাসসানের রাজার একটি পত্র আমার হাতে দেয়। পত্রটি রেশম বস্ত্রের উপর লিখিত ছিল। বিষয়বস্তু ছিল এই ঃ

"অতপর জানতে পারলাম যে, আপনার নবী আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং আপনাকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন, অথচ আল্লাহ আপনাদের এহেন লাঞ্ছনাও ধ্বংসের স্থানে রাখেননি। আমার এখানে আসা যদি ভাল মনে করেন চলে আসুন। আমরা আপনাদের সাহায্যে থাকবো।"

"পত্রটি পাঠ করে বললাম, হায়! এতো আরেক পরীক্ষা। কাফিররা আমার প্রতি আশাবাদী হয়ে উঠেছে (যাতে তাদের সাথে একাত্ম হই)। পত্রটি হাতে নিয়ে এগিয়ে চলি। কিছুদূর গিয়ে রুটির এক চুলোয় তা নিক্ষেপ করলাম।"

হযরত কা'আব (রা) বলেন, "পঞ্চাশ রাতের মধ্যে যখন চল্লিশ রাত অতিবাহিত হল তখন হঠাৎ নবী করীম (সা)-এর জনৈক দূত খোযাইমা বিন সাবিত (রা) আমার কাছে এসে বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদেশ, নিজ স্ত্রী থেকেও দূরে সরে থাক। আমি বললাম তাকে তালাক দিয়ে দেব, না অন্য কিছু ? তিনি বলেন, না। তবে কার্যত তার থেকে দূরে থাকবে; নিকটে যাবে না। এ ধরনের আদেশ অপর সঙ্গীদ্বয়ের কাছে পৌঁছে। আমি স্ত্রীকে বললাম, পিতৃগৃহে চলে যাও, সেখানে থাক এবং আল্লাহ্র ফয়সালার অপেক্ষা কর।

ওদিকে হেলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী খাওলা বিনতে আসেম এ আদেশ শুনে সোজা হুযুর (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমার স্বামী হেলাল বিন উমাইয়া বৃদ্ধ ও দুর্বল তার সেবা করার কেউ নেই। ইবনে আবি শায়বার রেওয়ায়েত মতে তিনি চোখেও কম দেখতেন। আসেম আরো বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্, তাঁর খিদমত করা কি আপনার পছন্দ নয়? তিনি বলেন, খিদমতে আপত্তি নেই, তবে সে যেন তোমার কাছে না যায়। আমি আরয করি, সে তো বার্ধক্যের এমন স্তরে পৌঁছেছে যে, নড়া চড়ার শক্তি নেই। আল্লাহ্র কসম, সে তো দিন-রাত শুধু কেঁদে চলেছে।

কা'আব বিন মালিক (রা) বলেন, 'বন্ধুজনেরা আমাকেও পরামর্শ দিয়েছিল যেন রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে গিয়ে স-পরিবারে থাকার অনুমতি চেয়ে নেই, যেমন তিনি হেলালকে অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু আমি তাদেরকে বললাম, আমি তা পারব না। জানিনা নবী করীম (সা) কি জবাব দেবেন। তা'ছাড়া আমি তো যুবক (স্ত্রী সাথে রাখা সতর্কতার পরিচায়ক নয়)। এমনিভাবে আরো দশটি রাত কাটিয়ে দিলাম। এতে মোট পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হলো। (মাসনাদে আবদুর রাযযাকের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে,) সে সময়ই রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আমাদের তওবা কবুল হওয়ার আয়াতটি নাযিল হয়। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, অনুমতি থাকলে এ সময় কা'আব বিন মালিক (রা)-কে সংবাদটি দেওয়ার ব্যবস্থা করি ? হুযুর (রা) বললেন, না। লোকেরা ভীড় জমাবে, ঘুমানো দুষ্কর হবে।'

কা'আব বিন মালিক (রা) বলেন, 'পঞ্চাশতম রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর ফজরের নামায আদায় করার পর ঘরের ছাদে বসেছিলাম আর কোরআনের ভাষায় অবস্থা ছিল এই ঃ 'পৃথিবী এত বিশাল হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য সংকুচিত হয়ে গেল।" হঠাৎ সিলা (سِلْع) পর্বতের চূড়া থেকে একটি আওয়ায শুনতে পেলাম---কে যেন বলছে, 'কা'আব বিন মালিকের জন্য সু-সংবাদ।'

মুহাম্মদ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ই সেই পর্বতের চূড়ায় উঠে চীৎকার করে বলছিলেন, আল্লাহ্ কা'আবের তওবা কবূল করেছেন, তার জন্য সুসংবাদ। হযরত ওকবার রেওয়ায়েত মতে কা'আবকে এ সংবাদ দেওয়ার জন্য দু'জন সাহাবী দ্রুতপদে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের একজন আগে চলে গেলেন। কিন্তু পেছনে যিনি ছিলেন তিনি 'সিলা' পর্বতের চূড়ায় উঠে সজোরে চীৎকার করে সংবাদটি প্রচার করে দিলেন। কথিত আছে, তাঁরা দুজন হলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও উমর ফারূক (রা)। কা'আব বিন মালিক বলেন, 'আমি এ চীৎকার শুনে সিজদায় চলে গেলাম। আনন্দাশ্রু দু'গণ্ড বেয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। বুঝতে পারলাম, সংকট কেটে গেছে। রসূলে করীম (সা) ফজরের নামাযের পর আমাদের তওবা কবূল হওয়ার সংবাদটি সাহাবাগণকেও দিলেন। তখন সবাই মোবারকবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে ত্রস্তপদে আমাদের তিনজনের দিকে ছুটে আসেন। কেউ ঘোড়া নিয়ে আমার দিকে ছুটলেন। তবে পাহাড়ে চীৎকারকারী ব্যক্তির আওয়াযও সবার আগে আমার কানেই পৌঁছেছিল।"

কা'আব বিন মালিক বলেন, 'আমি রসূলে করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হওয়ার জন্য বাইরে এসে দেখি, লোকেরা দলে দলে মোবারকবাদ জানাতে আসছেন। অতপর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দেখি, মহানবী (সা) সেখানেই অবস্থান করছেন আর তাঁর চারদিকে সাহাবায়ে কিরামের ভীড়। আমাকে দেখে সবার আগে তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ আমার কাছে এসে করমর্দন করলেন এবং তওবা কবূল হওয়ার জন্য মোবারকবাদ জ্ঞাপন করলেন। আমি তালহার এই দয়া কখনো ভুলব না। অতপর যখন আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম জানাই, তখন তাঁর পবিত্র চেহারা আনন্দে ঝলমল করছিল। তিনি বললেন, কা'আব, তোমার সুসংবাদ আজকের এই মোবারক দিনের জন্য, যা তোমার গোটা জীবনের দিনগুলো অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম। আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্ এ সংবাদ কি আপনার পক্ষ থেকে, না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে? ইরশাদ হল, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। তুমি সত্য কথা বলেছ বলে আল্লাহ্ তোমার সততা প্রকাশ করে দিলেন।

'আমি তাঁর সামনে বসে নিবেদন করলাম, আমার তওবা হলো, অর্থ-সম্পদ যা আছে সমুদয় ত্যাগ করব, সবই আল্লাহ্র রাহে করে দেব। তিনি বলেন, না, নিজের জন্যও কিছু রেখো, এটিই উত্তম। আরয করলাম, অর্ধেক সম্পদ দান করে দেব?

তিনি এতেও বারণ করলেন। অতপর এক-তৃতীয়াংশ সদকার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাতে সম্মত হলেন। অতপর আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা) সত্য বলায় আল্লাহ্ আমাকে নাজাত দিয়েছেন, তাই আমার প্রতিজ্ঞা হল এই যে, আমি জীবনে সত্য ছাড়া টু শব্দটিও করব না। হযরত কা'আব (রা) বলেন, 'আল্লাহ্র একান্ত শুকরিয়া যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে প্রতিজ্ঞা করার পর থেকে এ পর্যন্ত একটি কথাও মিথ্যা বলিনি।' তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্র কসম ইসলাম গ্রহণের পর এর চাইতে বড় নিয়ামত আর একটিও লাভ করিনি যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে সত্য কথা বলেছি, মিথ্যাকে ত্যাগ করেছি। কারণ, যদি মিথ্যা বলতাম, তবে সেই মিথ্যা শপথকারী লোকদের মতই আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম, যাদের সম্পর্কে কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ ... ... فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ কোন কোন মুফাসসির বলেন, পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তাঁদের বয়কট অব্যাহত থাকার মাঝে হয়ত এ রহস্য রয়েছে যে, তাবুক যুদ্ধের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়েছিল।

(পূর্ণ রেওয়ায়েত ও বিস্তারিত ঘটনা তফসীরে মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।)

উল্লিখিত হাদীসের তাৎপর্য

সাহাবী হযরত কা'আব বিন মালিক (রা) সবিস্তারে নিজের যে ইতিবৃত্তান্ত পেশ করেছেন, তাতে মুসলমানদের জন্য অগণিত ফায়দা ও হিদায়ত নিহিত রয়েছে। তাই উপরে পূর্ণ হাদীসটি উদ্ধৃত করা হলো। এখানে কতিপয় ফায়দা ও হিদায়তের উল্লেখ করা হচ্ছে।

(১) এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণত যুদ্ধের ব্যাপারে হুযুরে আকরাম (সা)-এর অভ্যাস ছিল, প্রকৃতপক্ষে তিনি যেদিকে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, মদীনা থেকে তার বিপরীত দিকে যাত্রা শুরু করতেন, যাতে শত্রুরা কোন জাতি বা গোত্রের সাথে মুকাবিলা হবে তা টের না পায়। একেই তিনি বলেছেন ঃ اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ অর্থাৎ যুদ্ধে ধোঁকা দেওয়া জায়েয আছে। এ থেকে অনেকের ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, যুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে শত্রুদের প্রতারিত করা জায়েয। অথচ, এটা যথার্থ নয়। বরং হুযুর (সা)-এর বলার উদ্দেশ্য ছিল, কাজেকর্মে এমন ভাব দেখানো যাতে শত্রুরা ধোঁকায় পড়ে। যেমন, যুদ্ধের জন্য বিপরীত দিক থেকে যাত্রা করা। কিন্তু পরিষ্কার মিথ্যা বলে ধোঁকা দেওয়া যুদ্ধের বেলায়ও জায়েয নেই। তেমনিভাবে একথা জানা থাকা দরকার

যে, এমন ক্ষেত্রে কাজেকর্মে যে ধোঁকা দেওয়া জায়েয তা যেন কোন চুক্তি বা অঙ্গীকারের সাথে সম্পৃক্ত না হয়। কারণ, অঙ্গীকার বা চুক্তিভঙ্গ করা যুদ্ধ বা শান্তি কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়।

(২) সফর তথা বিদেশ গমনের জন্য মহানবী (সা)-র পছন্দের দিন ছিল বৃহস্পতিবার। তা সে সফর জিহাদের জন্যই হোক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে।

(৩) নিজের কোন সম্মানিত ব্যক্তি, পীর, ওস্তাদ বা পিতাকে রাযী করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া জায়েয নয় এবং এর পরিণতি ভালও হবে না। ওহীর দ্বারা হুযূর পাক (সা) প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতেন বিধায় মিথ্যার পরিণতি অবশ্যই মন্দ হতো। কা'আব বিন মালিক (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের ঘটনা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হলো। কিন্তু মহানবী (সা)-র পরে অপরাপর বুযুর্গ ব্যক্তির কাছে ওহী না এলেও কিংবা ইলহাম ও কাশফের মাধ্যমে অবগত হওয়ার কোন নিশ্চয়তা না থাকলেও একথা পরীক্ষিত সত্য যে, মিথ্যার মন্দ প্রভাবে অবলীলাক্রমে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়, যাতে উক্ত বুযুর্গ শেষ পর্যন্ত নারায হয়ে উঠেন।

(৪) এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, কোন গুনাহর শাস্তিস্বরূপ সালাম-কালাম বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার মুসলিম নেতৃবর্গের রয়েছে।

(৫) নবী করীম (সা)-এর সাথে সাহাবায়ে কিরামের ভালবাসা যে কত গভীর ছিল তাও এ ঘটনা থেকে বোঝা গেল। তাঁদের সাথে সালাম-কালাম সবই বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কিন্তু হুযূর (সা)-এর কাছে নিয়মিত হাযিরা দিয়ে যেতেন এবং নানা কৌশলে তাঁর মনোভাব যাচাই করতে থাকতেন।

(৬) কা'আব বিন মালিক (রা)-এর একান্ত আপনজন কাতাদাহ্ (রা)-এর অবস্থা লক্ষ্য করা যাক, তিনিও যে সালাম-কালাম থেকে বিরত ছিলেন, তা কোন শত্রুতা কিংবা বিদ্বেষের কারণে ছিল না বরং তা যে একান্তই নবী করীম (সা)-এর আনুগত্যের কারণেই ছিল, সেকথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, মহানবী (সা)-র আইন-কানুন শুধু মানুষের বাহ্যিক দিককেই নয়, বরং তাদের অন্তরকেও ভেদ করে যেত। ফলে যেমন চোখের সামনে এবং অন্তরালেও তেমনিভাবে আইন মেনে চলতেন, তা একান্ত আপনজনের স্বার্থের যতই বিরোধী হোক না কেন।

(৭) গাস্সান রাজার পত্রকে আগুনে পুড়ে ভস্ম করার ব্যাপার থেকে সাহাবায়ে কিরামের ঈমান যে কতখানি পরিষ্কার ছিল, তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে। রসূলে করীম (সা) ও সকল মুসলমান সমাজচ্যুত থাকার অসহ্য-গ্লানি সত্ত্বেও একজন রাজার প্রলোভন বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করতে পারেনি।

(৮) তওবা কবুল হওয়ার আয়াত নাযিলের পর কা'আব বিন মালিক (রা)-কে এই সুসংবাদ দেওয়ার জন্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ফারূক সহ অন্যান্য

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর দৌড়ে যাওয়া এবং আয়াত নাযিলের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সালাম-কালাম ইত্যাদি বন্ধ রাখার বিষয়টি থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এ সময়েও তাঁদের অন্তরে হযরত কা'আব (রা)-এর যথেষ্ট দরদ ছিল, কিন্তু নবীর হুকুমের সামনে তা গৌণ হয়ে যায়। বস্তুত আয়াত নাযিলের পরে বোঝা গেল তাঁদের পরস্পর সম্পর্ক কত গভীর।

(৯) সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক হযরত কা'আব (রঃ)-কে সুসংবাদ ও মোবারকবাদ দানের উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহে গমন থেকে জানা যায়, কোন আনন্দঘন মুহূর্তে বন্ধু-বান্ধবকে মোবারকবাদ দেওয়া সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত।

(১০) কোন গুনাহের তওবাকালে মালামাল সদকা করা গুনাহের দোষ নিবারণের জন্য উত্তম। কিন্তু সমুদয় মাল সদকা করা ভাল নয়। এক-তৃতীয়াংশের অধিক সদকা করা রসূলে করীম (সা)-এর অপছন্দ ছিল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ পূর্ববর্তী

আয়াতসমূহে জিহাদ থেকে বিরত থাকার যে ত্রুটি কতিপয় নিষ্ঠাবান সাহাবীর দ্বারাও সংঘটিত হয়ে গেল এবং পরে তাঁদের তওবা কবুল হলো, এ ছিল তাঁদের তাকওয়া ও আল্লাহ্ ভীতিরই ফলশ্রুতি। তাই এ আয়াতের মাধ্যমে সমস্ত মুসলমানকে তাকওয়ার হিদায়ত দান করা হয়েছে। আর وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ তোমরা সবাই সত্যবাদীদের সাথে থাক) বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যবাদীদের সাহচর্য এবং তাদের অনুরূপ আমলের মাধ্যমেই তাকওয়া লাভ হয়। এখানে এমনও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ঐ সকল সাহাবীর পদস্খলনের মধ্যে মুনাফিকদের সাথে উঠাবসা ও তাদের পরামর্শেরও একটা দখল ছিল। তাই নাফরমানদের সাহচর্য ত্যাগ করে সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন করা প্রয়োজন। কোরআনের এ আয়াতে আলিম ও সালেহ্গণের পরিবর্তে 'সাদেকীন' শব্দ ব্যবহার করে আলিম ও সালেহ্-এর প্রকৃত পরিচয় দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই যথার্থ সালেহ্ বা নেককার যে ভিতরে ও বাইরে সমান এবং নিয়ত ও ইচ্ছায় এবং কথা ও কর্মে সমান সত্য হয়।

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا
يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ
مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ

بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَلَا يُنْفِقُوْنَ
نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ
لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

(১২০) মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহ্‌র পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়---তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না। (১২১) আর তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লেখা হয়, যেন আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মসমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মদীনার অধিবাসী ও আশেপাশের বাসিন্দাদের উচিত ছিল না রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গ ত্যাগ করা কিংবা নিজেদের প্রাণকে তাঁর প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় মনে করাও (উচিত ছিল না যে, তিনি কষ্টভোগ করবেন আর তারা দিব্যি আরামে বসে থাকবে; বরং তাঁর সাথে যাওয়াই ছিল কর্তব্য) আর (এ আবশ্যকতা) এ জন্য যে, (এতে নবীর প্রতি ভালবাসার দাবি পূরণ হওয়া ছাড়াও প্রতি পদক্ষেপে মুজাহিদগণের সওয়াব হাসিল হতো। তাই এরাও যদি নিষ্ঠার সাথে তাঁর সহযাত্রী হতো, তবে এ প্রতিদান পেত। সুতরাং আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করতে গিয়ে) তাদের যে তৃষ্ণা ক্লান্তি ও ক্ষুধা পেয়েছে এবং তাদের যে পদক্ষেপ শত্রুদের ক্রোধের কারণ হয়েছে এবং তারা শত্রুপক্ষের উপর যে আঘাত হেনেছে, তার প্রতিটির বিনিময়ে তাদের জন্য একেকটি নেক আমল লেখা হয়েছে। (যদিও এর কয়েকটি বিষয় মানুষের ইখতিয়ারভুক্ত নয়, তা সত্ত্বেও মকবুল ও প্রীত হওয়ার দাবি মতে ইখতিয়ার বহির্ভূত আমলের জন্যও ইখতিয়ারী আমলের মতই সওয়াব দেওয়া হয়েছে। আর এ অঙ্গীকারের সিদ্ধান্ত মুলতবী রাখার সম্ভাবনা নেই। কেননা) আল্লাহ্ নিষ্ঠাবান মু'মিনদের প্রাপ্য বিনষ্ট করেন না। (এ প্রতিশ্রুতি তো দেওয়া হলোই) তদুপরি (এ কথাও নিশ্চিত যে,) তারা ছোট-বড় যা ব্যয় করেছে এবং যত প্রান্তর তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে, সে সবই তাদের নামে (নেক আমল হিসাবে) লিখিত হয়েছে, যাতে আল্লাহ্ (এসব) নেক আমলের সর্বোত্তম বিনিময় তাদের দান করেন। (কেননা সওয়াব যখন লিখিত হলো, বিনিময় অবশ্যই পাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য দু'টি আয়াতে জিহাদ থেকে পেছনে পড়ে থাকার নিন্দা, জিহাদকারী-দের ফযীলত এবং জিহাদের ব্যাপারে প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কথা ও কর্মে এবং যাবতীয় পরিশ্রমের সর্বোত্তম বিনিময়ের উল্লেখ রয়েছে। ফলে জিহাদকালে শত্রুর প্রতি কোন আঘাত হানা এবং শত্রুকে ক্রোধান্বিত করার ভঙ্গিতে চলা প্রভৃতি সব বিষয়েই নেক আমলের সওয়াব হয়।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ
طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

(১২২) আর সমস্ত মু'মিনদের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সার্বক্ষণিকভাবে) মুসলমানদের সকলের (সমবেতভাবে জিহাদের) বের হয়ে পড়া সঙ্গত নয়। (কারণ, এতে অন্যান্য ধর্মীয় কার্যাদি বিঘ্নিত হয়।) কাজেই তাদের প্রত্যেক বড় দল থেকে একেকটি ছোট দলের (জিহাদে) গমন করা (এবং কিছু লোকের দেশে থাকাই) সমীচীন, যাতে অবশিষ্ট লোকেরা [মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় তাঁর কাছ থেকে এবং তাঁর পর স্থানীয় ওলামায়ে কিরামের কাছ থেকে] দীনের জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং যাতে তারা স্বজাতিকে (যারা যুদ্ধে গমন করেছে দীনের কথা শুনিয়ে আল্লাহ্‌র নাফরমানী থেকে) ভীতি প্রদর্শন করতে পারে, যখন তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা (দীনের কথা শুনে পাপাচার থেকে) বাঁচতে পারে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা তওবায় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাবুক যুদ্ধের ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়েছে। এ যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য নবী করীম (সা)-এর পক্ষ থেকে সাধারণ ঘোষণা দেওয়া হয়। বিনা ওযরে এ আদেশের বিরুদ্ধাচরণ জায়েয ছিল না। যারা আদেশ লংঘন করেছে তাদের অধিকাংশই ছিল মুনাফিক। এ সূরার অনেক আয়াতে

তাদের আলোচনা এসেছে। আর কিছু নিষ্ঠাবান মু'মিনও ছিলেন, যারা সাময়িক অলসতার দরুন জিহাদ থেকে বিরত ছিলেন। আল্লাহ তাঁদের তওবা কবুল করেছেন। এ সমস্ত ঘটনা থেকে বাহ্যত বোঝা যেতে পারে যে, প্রত্যেক জিহাদে গমন করাই প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য ফরয এবং জিহাদ থেকে বিরত থাকা হারাম অথচ শরীয়তের হুকুম তা নয়। বরং শরীয়ত মতে সাধারণ অবস্থায় জিহাদ 'ফরযে কিফায়া'। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুসলমান জিহাদে অংশ নিলেই অবশিষ্ট মুসলমানদের পক্ষ থেকেও এ ফরয আদায় হয়ে যায়। কিন্তু জিহাদকারী যদি যথেষ্ট সংখ্যক না হয় এবং যদি তাদের পরাজিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তবে আশপাশের মুসলমানদের জিহাদে যোগ দেওয়া এবং দলের শক্তি বৃদ্ধি করা ফরয হয়ে দাঁড়ায়। তারাও যদি যথেষ্ট না হয়, তবে তাদের পার্শ্ববর্তী লোকদের এবং তারাও যথেষ্ট না হলে তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলমানগণ এমনকি প্রয়োজনবোধে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানের পক্ষে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া 'ফরযে আইন' হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় জিহাদ থেকে বিরত থাকা হারাম। তেমনিভাবে মুসলমানদের আমীর যদি প্রয়োজন বোধে সকল মুসলমানকেই জিহাদে যোগ দেওয়ার সাধারণ আদেশ জারি করেন, তবুও জিহাদ সবার উপরে ফরয হয়ে যায়। তখনও জিহাদ থেকে বিরত থাকা হারাম। যেমন তাবুক যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আদেশ জারি হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। তাবুক যুদ্ধে সাধারণ যুদ্ধের ঘোষণা ছিল এক বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে, অথচ সাধারণ অবস্থায় জিহাদ 'ফরযে আইন' নয় এবং এতে সকলের সমবেতভাবে যোগ দেওয়াও ফরয নয়। কেননা, জিহাদের মত ইসলাম ও মুসলমানদের আরো অনেক সমষ্টিগত সমস্যা রয়েছে, যার সমাধান জিহাদের মতই ফরযে কিফায়া। আর তা হবে দায়িত্ব বন্টনের নীতিমালার ভিত্তিতে অর্থাৎ মুসলমানদের বিভিন্ন দল ও বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে। তাই সকল মুসলমানের পক্ষে একই সময়ে জিহাদে যোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

এ আলোচনা থেকে 'ফরযে কিফায়া'র পরিচয় জানা গেল। অর্থাৎ যে কাজ ব্যক্তিগত নয়; বরং সমষ্টিগত এবং সকল মুসলমানের পক্ষে তা সমাধা করা কর্তব্য, শরীয়তের দৃষ্টিতে তাকেই ফরযে কিফায়া বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাতে দায়িত্ব বন্টনের নীতি অনুসারে যাবতীয় কার্য স্ব-স্ব গতিতে চলতে পারে এবং সমষ্টিগত দায়িত্বগুলোও আদায় হয়ে যায়। মুসলমান পুরুষের পক্ষে জানাযার নামায, কাফন-দাফন, মসজিদ নির্মাণ, তার হিফাযত ও সীমান্ত রক্ষা প্রভৃতি হলো ফরযে কিফায়া। সাধারণত বিশ্বের সকল মুসলমানের উপরই এ দায়িত্ব বর্তায়। কিন্তু যদি কিছুসংখ্যক লোক তা আদায় করে তবে সবাই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়।

ফরযে কিফায়ার মধ্যে দীনের তা'লীম সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য আয়াতে তালীমে-দীনের গুরুত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে যে, জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলাকালেও যেন দীনের তা'লীম স্থগিত না হয়। সে জন্য প্রত্যেক বড় দল থেকে একেকটি ছোট

দল জিহাদে বের হবে এবং অবশিষ্ট লোকেরা দীনী ইলম হাসিলে নিয়োজিত থাকবে। অতপর তারা ইলম হাসিল করে মুজাহিদ ও অপরাপর লোককে দীনী তা'লীম দেবে।

দীনের ইলম হাসিল ও সংশ্লিষ্ট নীতি-নিয়ম

ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, এ আয়াতটি দীনের ইলম হাসিলের মৌলিক দলীল। চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, এতে দ্বীনী ইলমের এক সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচী এবং ইলম হাসিলের পর আলিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হবে তাও বলে দেওয়া হয়েছে। এখানে বিষয়টির কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

দীনী ইলমের ফযীলত ঃ দীনী ইল্‌মের অগণিত ফযীলত ও সওয়াব সম্পর্কে ওলামায়ে কিরাম ছোট-বড় অনেক কিতাব লিখেছেন। এখানে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত হাদীস পেশ করা হলো। তিরমিযী শরীফে আবুদ্দারদা (রা) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলে করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোন পথ দিয়ে চলে, আল্লাহ্ এই চলার সওয়াব হিসাবে তার রাস্তাকে জান্নাতমুখী করে দেবেন। আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ দীনী জ্ঞান আহরণকারীর জন্য নিজেদের পালক বিছিয়ে রাখেন। আলিমের জন্য আসমান-যমীনের সমস্ত সৃষ্টি এবং পানির মৎস্যকুল দোয়া ও মাগফিরাত কামনা করে। অধিক হারে নফল ইবাদতকারী লোকের উপর আলিমের ফযীলত অপরাপর তারকারাজির উপর পূর্ণিমা চাঁদেরই অনুরূপ। আলিম সমাজ নবীগণের ওয়ারিস। নবীগণ সোনা রূপার মীরাস রেখে যান না। তবে ইল্‌মের মীরাস রেখে যান। তাই যে ব্যক্তি ইল্‌মের মীরাস পায়, সে যেন মহা সম্পদ লাভ করলো। ---(কুরতুবী)

ইমাম দারেমী (র) স্বীয় 'মাসনাদ' গ্রন্থে এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন যে, জনৈক সাহাবী নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ বনী ইসরাইলের দু'জন লোক ছিলেন, যাদের একজন ছিলেন আলিম। তিনি শুধু নামায ও লোকদের দীনী তা'লীম দানে ব্যস্ত থাকতেন। অপরজন সারাদিন রোযা রাখতেন এবং সারারাত ইবাদতে নিয়োজিত থাকতেন। এ দু'জনের মধ্যে কার ফযীলত বেশি ? হুযুর (সা) বলেন, সেই আলিমের ফযীলত আবেদের উপর এমন, যেমন আমার ফযীলত তোমাদের সাধারণ মানুষের উপর।---(কুরতুবী) রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেন, শয়তানের মুকাবিলায় একজন ফিকাহবিদ একা হাজার আবেদের চাইতেও শক্তিশালী ও ভারী।---(তিরমিযী, মাযহারী) তিনি আরে বলেন, মানুষের মৃত্যু হলে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। এক. সদকায়ে জারিয়া---(যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান)। দুই. ইল্‌ম---যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হয়। (যেমন, শাগরিদ রেখে গিয়ে ইল্‌মে দীনের চর্চা জারি রাখা বা কোন কিতাব লিখে যাওয়া।) তিন. নেককার সন্তান---যে তার পিতার জন্য দোয়া করে এবং সওয়াব পাঠাতে থাকে।---(কুরতুবী)।

দীনী ইল্‌ম ফরযে-আইন অথবা ফরযে-কিফায়া হওয়ার বিবরণ

ইবনে আ'দী ও বায়হাকী বিশুদ্ধ সনদে হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ "প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয।" বলা বাহুল্য, এ হাদীস ও উপরোক্ত অপরাপর হাদীসে উল্লিখিত 'ইল্‌ম' শব্দের অর্থ দীনের ইল্‌ম। তবে অন্যান্য বিষয়ের মত দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞানও মানুষের জন্য জরুরী। কিন্তু হাদীসসমূহে সে সবের ফযীলত বর্ণিত হয়নি। অতপর দীনী ইল্‌ম বলতে একটি মাত্র বিষয়ই বোঝায় না; বরং তা বহু বিষয়েরই উপর পরিব্যাপ্ত এক বিরাট ব্যবস্থা। সুতরাং সমস্ত বিষয়ই একা আয়ত্ত করা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই উল্লিখিত হাদীসে প্রত্যেক মুসলমানের উপরই যে ইল্‌ম তলব ফরয করা হয়েছে, তার অর্থ হবে এই যে, সমস্ত মুসলমানের জন্য দীনী ইল্‌মের শুধু সে অংশটি আয়ত্ত করাই ফরয করা হয়েছে, যা ঈমান ও ইসলামের জন্য জরুরী এবং যার অবর্তমানে মানুষ না পারে ফরযসমূহ আদায় করতে, আর না পারে হারাম বিষয় থেকে বাঁচতে। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়, কোরআন-হাদীসের মাস'আলা মাসায়েল, কোরআন-হাদীস থেকে আহরিত শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা আয়ত্তে আনা সকল মুসলমানের পক্ষে সম্ভবও নয় এবং ফরযে-আইনও নয়। তবে গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য তা ফরযে কিফায়া। তাই প্রত্যেকটি শহরেই যদি শরীয়তের উপরোক্ত ইল্‌ম ও আইন-কানুনের একজন সুদক্ষ আলিম থাকেন, তবে অন্যান্য মুসলমান এ ফরযের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। কিন্তু যে শহর বা পল্লীতে একজনও অভিজ্ঞ আলিম না থাকেন, তবে তাদের কাউকেই আলিম বানানো বা অন্যখান থেকে কোন আলিমকে ডেকে এনে এখানে রাখার ব্যবস্থা করা স্থানীয় লোকের পক্ষে ফরয, যাতে করে যে কোন প্রয়োজনীয় মাস'আলা-মাসায়েল সম্পর্কে তার কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে সেমত আমল করা যায়। দীনী ইল্‌ম সম্পর্কে ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়ার তফসীল নিম্নরূপ ঃ

ফরযে আইন ঃ ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাসমূহের জ্ঞান হাসিল করা, পাকী-নাপাকীর হুকুম-আহকাম জানা, নামায-রোযা ও অন্যান্য ইবাদত বা শরীয়ত যেসব বিষয় ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর জ্ঞান রাখা এবং যেসব বিষয় হারাম বা মকরূহ করে দিয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নেসাবের মালিক, তার জন্য যাকাতের মাস'আলা-মাসায়েল জানা, যে হজ্জ আদায় করতে সমর্থ তার পক্ষে তার আহ্‌কাম ও মাসায়েল জেনে নেয়া, যে ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনাবেচা বা শিল্প কারখানায় নিয়োজিত, তার পক্ষে সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহ্‌কাম জেনে রাখা এবং যে বিয়ের উদ্যোগ নিচ্ছে, তার পক্ষে বিয়ে ও তালাকের মাস'আলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবগত হওয়া ফরয। এক কথায় শরীয়ত

মানুষের উপর যেসব কাজ ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর হুকুম-আহকাম ও মাস'আলা-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয।

ইল্‌মে তাসাউফও ফরযে-আইনের অন্তর্ভুক্ত ঃ শরীয়তের জাহিরী হুকুম তথা নামায-রোযা প্রভৃতি যে ফরযে-আইন তা সর্বজনবিদিত। তাই সেগুলোর ইলম রাখাও ফরযে-আইন। হযরত কাজী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) তফসীরে মাযহারীতে এ আয়াতের টীকায় লিখেছেন যে, যেহেতু বাতেনী আমলও সকলের জন্য ফরযে আইন, তাই বাতেনী আমল ও বাতেনী হারাম বস্তুর ইলম---যাকে পরিভাষায় 'ইলমে তাসাউফ' বলা হয়, তা হাসিল করাও ফরযে-আইন।

অধুনা বিভিন্ন ইল্‌ম, তত্ত্বজ্ঞান, কাশ্‌ফ ও আত্মোপলব্ধির সম্মিলিত রূপকে ইল্‌মে তাসাউফ বলা হয়। তবে এখানে ফরযে-আইন বলতে বাতেনী আমলের শুধু সে অংশকেই বোঝায়, যা ফরয-ওয়াজিবের তফ্‌সীল। যেমন, বিশুদ্ধ আকীদা, যার সম্পর্ক বাতেন তথা অন্তরের সাথে অথবা সবর, শোকর ও তাওয়াক্কুল প্রভৃতি এক বিশেষ স্তর পর্যন্ত ফরয, কিংবা গর্ব-অহঙ্কার, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, কৃপণতা ও দুনিয়ার মোহ প্রভৃতি কোরআন ও হাদীস মতে হারাম। এগুলোর গতি-প্রকৃতি, অথবা সেগুলো হাসিল করার কিংবা হারাম থেকে বেঁচে থাকার নিয়ম-নীতি জেনে রাখাও সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয। এ সকল বিষয়ের উপরই হল ইল্‌মে তাসাউফের আসল ভিত্তি, যা ফরযে আইন।

ফরযে কিফায়া ঃ পূর্ণ কোরআন মজীদের অর্থ ও মাস'আলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবহিত হওয়া, সমুদয় হাদীসের মর্ম বোঝা, বিশুদ্ধ ও দুর্বল হাদীস সম্পর্কে ওয়াকিফ-হাল থাকা, কোরআন ও হাদীস থেকে নির্গত আহকাম ও মাসায়েলের জ্ঞান অর্জন এবং এ সমস্ত ব্যাপারে সাহাবা, তাবেয়ীন ও মুজতাহিদ ইমামগণের ভাষ্য ও আমল সম্পর্কে অবগত হওয়া। বস্তুত এটি এত বড় কাজ যে, গোটা জীবন এতে নিয়োজিত থেকেও এ সম্পর্কিত পূর্ণ জ্ঞান হাসিল করা দুঃসাধ্য। তাই শরীয়ত একে ফরযে-কিফায়া রূপে সাব্যস্ত করেছে অর্থাৎ কিছু লোক যদি প্রয়োজনমত এগুলোর জ্ঞান হাসিল করে নেয়, তবে অন্যরাও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

দীনী ইলমের সিলেবাস ঃ কোরআন মজীদ আলোচ্য আয়াতের একটি মাত্র শব্দে দীনী ইল্‌মের প্রকৃতি ও তার পাঠ্যক্রম কি হবে তা ব্যক্ত করে দিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ يَتَعَلَّمُونَ الدِّينَ অথচ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (যেন দীনের জ্ঞান হাসিল করে)-ও বলা যেত। কিন্তু কোরআন এখানে تَعَلَّمَ -এর স্থলে تَفَقَّهَ শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করেছে যে, নিছক দীনের ইল্‌ম 'পাঠ' করাই যথেষ্ট নয়। কারণ, ইহুদী ও খৃস্টানেরাও তা' পাঠ করে, আর শয়তান তো এক্ষেত্রে তাদের সকলের আগে;

বরং ইল্‌মে দীনের উদ্দেশ্য হলো দীনকে অনুধাবন করা কিংবা তাতে বিজ্ঞতা অর্জন করা। تَفَقُّه শব্দের অর্থও তাই। এটি فِقْه থেকে উদ্ভূত। فِقْه অর্থ বোঝা, অনুধাবন করা। উল্লেখ্য যে, কোরআন মজীদ এ আয়াতে صِيغَةُ مجرد ব্যবহার করে لِيَفْقَهُوا فِي الدِّينِ (যেন তারা দীনকে বুঝে নেয়) বলেনি; বরং একে باب تفعل এ নিয়ে لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ বলেছে। ফলে এতে পরিশ্রম ও সাধনাও শামিল হয়ে গেছে। সেমতে বাক্যের মর্ম হবে "তারা যেন দীন অনুধাবনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাতে দক্ষতা হাসিল করে।" বলা বাহুল্য, পাকী-নাপাকী, নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাতের মাস'আলা-মাসায়েল জানাকেই দীনকে অনুধাবন করা বলা যাবে না। বরং দীনের সত্যিকার অনুধাবন হলো, তাকে বুঝে, তার প্রতিটি কথা ও কর্ম এবং যাবতীয় গতিবিধির হিসাব দিতে হবে রোজ হাশরে। দুনিয়ার এ জীবন তাকে কিরূপে অতিবাহিত করতে হবে—মূলত এ চিন্তাই হলো দীন অনুধাবন। এজন্য ইমাম আবূ হানীফা (র) 'ফিকহ্'-এর যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তা হলো এই যে, "ফিকাহ্ সেই শাস্ত্রকে বলা হয়, যাতে মানুষ নিজের করণীয় কাজকে বুঝে নেয় এবং সে সকল কাজকেও বুঝে নেয়, যা থেকে বেঁচে থাকা তার জন্য জরুরী।" অধুনা মাস'আলা-মাসায়েলের বিস্তারিত জ্ঞানকেই যে 'ইলমে-ফিকহ্' বলা হয় তা পরবর্তী যুগের পরিভাষা। কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী ফিকহ্‌র তাৎপর্য তা-ই, যা ইমাম আবূ হানীফা (র) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দীনের সমস্ত কিতাব পাঠ করে নিল, কিন্তু দীনকে পুরোপুরি বুঝতে পারল না, সে কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় আদৌ আলিম নয়।

এ তত্ত্ব থেকে বোঝা গেল যে, কোরআনের পরিভাষায় দীনের ইল্‌ম হাসিল করার অর্থ হলো, দীন সম্পর্কে প্রজ্ঞা অর্জন করা। তা কিতাবের মাধ্যমে বা আলিমগণের সাহায্যে যে কোন উপায়েই হোক—সব একই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত।

ওলামায়ে কিরামের দায়িত্ব ঃ দীনের জ্ঞান হাসিলের পর ওলামায়ে কিরামের দায়িত্ব কি হবে তার পূর্ণ বিবরণ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ (যেন তারা জাতিকে আল্লাহ্‌র নাফরমানী থেকে ভয় প্রদর্শন করে) বাক্যটিতে। উল্লেখ্য, এখানে আলিমগণের দায়িত্ব বলা হয়েছে اِنْذَار বা ভয় প্রদর্শন। এটি اِنْذَار-এর শাব্দিক তরজমা, যথাযথ মর্মার্থ নয়। বস্তুত ভয় প্রদর্শন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের ভীতি প্রদর্শন হলো, চোর-ডাকাত শত্রু, হিংস্র জন্তু ও বিষাক্ত প্রাণী থেকে ভয় প্রদর্শন করা। অন্য ধরনের হলো পিতা স্নেহবশে আপন ছেলেকে আগুন, বিষাক্ত

প্রাণী ও অন্যান্য কষ্টদায়ক বস্তু থেকে যে ভয় প্রদর্শন করে। এর মূলে থাকে প্রগাঢ় মমতা, স্নেহবোধ। এ ভয় প্রদর্শনের কলাকৌশলও ভিন্ন। আরবীতে একেই বলা হয় اِنْذَار ---এজন্য নবী-রসূলগণ نَذِيْر উপাধিতে ভূষিত। আলিমগণের উপর জাতিকে ভয় প্রদর্শনের যে দায়িত্ব রয়েছে, তা মূলত নবীগণের আংশিক মীরাস---যা হাদীসমতে ওলামায়ে কিরাম লাভ করেছেন।

তবে এখানে উল্লেখ্য, নবীগণ نَذِيْر ও بَشِيْر উভয় উপাধিতেই ভূষিত। نَذِيْر-এর অর্থ উপরে জানা গেল। আর بَشِيْر অর্থ সুসংবাদ দানকারী। সুতরাং নবীগণের উপর দায়িত্ব হলো সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দান করা। আলোচ্য আয়াতে যদিও শুধু ভয় প্রদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অন্য দলীলের দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, আলিমগণের অন্যতম দায়িত্ব হলো নেক্‌কার বান্দাদিগকে সুসংবাদ দেওয়া। তবে এখানে শুধু ভয় প্রদর্শনের উল্লেখ থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষের আসল কাজ দু'টি। (এক) দুনিয়া ও আখিরাতে যা কল্যাণকর, তা অবলম্বন করা এবং (দুই) অকল্যাণ ও অনিষ্টকর কাজ থেকে বেঁচে থাকা। আলিম ও দার্শনিকদের ঐকমত্যে শেষোক্ত কাজটিই গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। ফিকাহ্‌বিদগণের পরিভাষায় একে جلب منفعت (উপকার লাভ) دفع مضرت (লোকসান পরিহার) নামে অভিহিত করে দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে লোকসান পরিহারেও উপকার লাভের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কেননা, যে কাজ মানুষের জন্য কল্যাণকর ও বাঞ্ছনীয় তা ত্যাগ করা বড়ই ক্ষতিকর। সুতরাং ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে যে বাঁচতে চায়, সে করণীয় কর্মে অলসতা থেকেও দূরে থাকবে।

এ আলোচনা থেকে আরও একটি কথা জানা যায়। বর্তমান যুগে ওয়ায ও নসীহতের কার্যকারিতা যে খুব কম পরিলক্ষিত হয়, তার প্রধান কারণ হলো, ভয় প্রদর্শনের নিয়ম-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য না রাখা। যে ওয়ায়েযের কথা ও ভাবভঙ্গি থেকে দয়া-প্রীতি ও কল্যাণ কামনা পরিস্ফুট হবে, শ্রোতার নিশ্চিত বিশ্বাস থাকবে যে, এ ওয়াযের উদ্দেশ্য তাকে নিন্দা ও খাটো করাও নয় এবং মনের রোষ মেটানোও নয়; বরং তার পক্ষে যা কল্যাণকর ও আবশ্যকীয় তাই বলা হচ্ছে পরম স্নেহভরে। শরীয়তের প্রতি অমনোযোগী লোকদের সংশোধন এবং দীন প্রচারে যদি উপরোক্ত নীতি অবলম্বিত হয়, তবে কখনো শ্রোতাবৃন্দ জেদের বশবর্তী হবে না। তারা তর্কে অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে নিজেদের আমলের বিচার-বিশ্লেষণ ও পরিণাম চিন্তায় নিয়োজিত হবে এবং এ ধারা অব্যাহত থাকলে একদিন ওয়ায-নসীহত কবুল করে বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয়ত আর কিছু না হলেও অন্তত পরস্পরের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে না, যার অভিশাপে আজ গোটা জাতি জর্জরিত।

আয়াতের শেষে لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ বলে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, আলিম সমাজের দায়িত্ব শুধু ভয় প্রদর্শন করাই নয়; বরং ওয়ায-নসীহতের ক্রিয়া হচ্ছে কিনা সে বিষয়েও তাঁদের লক্ষ্য রাখতে হবে। একবার ক্রিয়া না হলে বারংবার তাকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যেন يَحْذَرُونَ-এর সুফল লাভ হয়। আর তা হলো পাপ ও নাফরমানী থেকে জাতির বেঁচে থাকা।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا۟
فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ
سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم
مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ﴿١٢٥﴾
أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا
يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ
إِلَىٰ بَعْضٍ ۖ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا۟ ۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾

(১২৩) হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (১২৪) আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করলো? অতএব যারা ঈমানদার, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে। (১২৫) বস্তুত যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এটি তাদের কলুষের সাথে আরো কলুষ বৃদ্ধি করেছে এবং তারা কাফির অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করলো। (১২৬) তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতিবছর তারা, দু'একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অথচ তারা এরপরও তওবা করে

না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না। (১২৭) আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকায় যে, কোন মুসলমান তোমাদের দেখছে কি-না— অতপর সরে পড়ে। আল্লাহ্ ওদের অন্তরকে সত্য বিমুখ করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তারা নির্বোধ সম্প্রদায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের আশপাশে বসবাসকারী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর এবং (এমন ব্যবস্থা কর, যাতে) অবশ্যই তোমাদের মধ্যে তারা কঠোরতা অনুভব করে। (অতএব, জিহাদ চলাকালে তোমাদের শক্ত থাকা উচিত। এছাড়া সন্ধিবিহীন কালেও যেন তারা কোনরূপ প্রশ্রয় না পায়) আর বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ্ (-এর সাহায্য) মুত্তাকীদের সাথে রয়েছে। (সুতরাং তাদের ভয় করো না।) আর যখন কোন (নতুন) সূরা নাযিল হয়, তখন কতিপয় মুনাফিক (গরীব মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপ করে) বলে (বল তো দেখি) এই সূরা তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি করেছে? (আল্লাহ্ পাক বলেন, তোমরা কি জবাব চাও?) তা'হলে (শোন) যারা ঈমানদার, এই সূরা তাদের ঈমানকে (তো) উন্নত করেছে এবং তারা (এ উন্নতি উপলব্ধি করে) আনন্দিত (-ও বটে। কিন্তু এ হলো অন্তরের অনুভূতি, যা থেকে তোমরা বঞ্চিত বিধায় হাসি-বিদ্রূপ করছ।) আর যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) ব্যাধি বিদ্যমান, এ সূরা তাদের (পূর্ব) কলুষতার সাথে আরো (নতুন) কলুষতা বৃদ্ধি করেছে। (পূর্ব কলুষতা হলো কোরআনের এক অংশের প্রতি অস্বীকৃতি আর নতুন কলুষতা হলো, সদ্য অবতীর্ণ অংশের অস্বীকার।) এবং তারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। (অর্থাৎ তাদের এ পর্যন্ত যারা মরেছে এবং যারা কুফরীর উপর অবিচল থাকবে, তারাও কাফির অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবে। সারকথা, ঈমান বর্ধনের গুণাবলী—অবশ্যই কোরআনে রয়েছে, কিন্তু সেজন্য চাই পাত্রের যোগ্যতা। অন্যথায় পূর্ব থেকেই যদি কলুষতা পাকাপোক্ত থাকে, তবে তা আরো অধিক পোক্ত হয়ে উঠবে। যেমন, পলিমাটিতে হয় ফুলের বাগান আর লোনা মাটিতে হয় আগাছা)। তারা কি লক্ষ্য করে না যে, প্রতিবছরই তারা দু'একবার কোন-না-কোনভাবে বিপদগ্রস্ত হচ্ছে (অথচ) তারপরও তারা (পাপাচার থেকে) ফিরে আসে না এবং তারা একথাও বোঝে না [যাতে ভবিষ্যতে ফিরে আসার আশা করা যায়। অর্থাৎ এ সকল বিপদাপদ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে নিজেদের সংশোধন করা আবশ্যক ছিল। এ হচ্ছে তাদের বিদ্রূপের বিবরণ। পরবর্তী আয়াতে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর মজলিসে তাদের ঘৃণা প্রকাশের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে—] আর যখন কোন (নতুন) সূরা নাযিল হয়, তখন তারা একে অন্যের (মুখের) দিকে তাকায় (এবং ইশারা-ইঙ্গিতে বলে,) তোমাদেরকে কোন মুসলমান দেখছে না তো [যে উঠে গিয়ে, নবী (সা)-কে তা বলে,] অতপর (আকার-ইঙ্গিতে যা বলার, তা বলে সেখান থেকে) প্রস্থান করে। (তারা যে মসজিদে নববী থেকে ফিরে গেল, তার ফলে) আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে (ঈমান থেকে) ফিরিয়ে রেখেছেন এজন্য যে, তারা নির্বোধ সম্প্রদায় (ফলে নিজের কল্যাণ থেকেও পলায়নপর থাকে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ছিল জিহাদের প্রেরণা। আলোচ্য প্রথম আয়াতে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا -এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হচ্ছে যে, কাফিররা দুনিয়ার সর্বত্রই রয়েছে। তবে কোন্ নিয়মে তাদের সাথে জিহাদ করা হবে? এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, প্রথমে তাদের সাথে জিহাদ করবে। নিকটবর্তী দু'রকমের হতে পারে। (এক) অবস্থানের দিক দিয়ে অর্থাৎ যারা তোমাদের নিকটে অবস্থানকারী, প্রথমে তাদের সাথে জিহাদ কর। (দুই) গোত্র, আত্মীয়তা ও সম্পর্কের দিক দিয়ে নিকটবর্তী অন্যদের আগে তাদের সাথে জিহাদ চালিয়ে যাও। কারণ, ওদের কল্যাণ সাধনই ইসলামী জিহাদের উদ্দেশ্য। আর কল্যাণ সাধনের বেলায় আত্মীয়-স্বজন অগ্রগণ্য। যেমন, কোরআনে রসূলে করীম (সা)-কে আদেশ দেয়া হয়েছে—وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ অর্থাৎ "হে রসূল, নিজের নিকটাত্মীয়গণকে আল্লাহ্র আযাবের ভয় প্রদর্শন করুন।" তাই তিনি এ আদেশ পালনে সর্বাগ্রে স্বগোত্রীয়দের সমবেত করে আল্লাহ্র বাণী শুনিয়ে দেন। অনুরূপ, তিনি স্থান হিসাবে প্রথমে মদীনার আশপাশের কাফির তথা বনূ-কুরায়যা, বনূনযীর ও খায়বরবাসীদের সাথে বোঝাপড়া করেন। তারপর দূরবর্তী লোকদের সাথে জিহাদ করেন এবং সবশেষে রোমানদের সাথে জিহাদের আদেশ আসে, যার ফলে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

غِلْظَةً - وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً অর্থ কঠোরতা, শক্তিমত্তা। বাক্যের মর্ম হলো কাফিরদের সাথে এমন ব্যবহার কর, যাতে তোমাদের কোন দুর্বলতা তাদের চোখে ধরা না পড়ে। فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا বাক্য থেকে বোঝা যায়, কোরআনের আয়াতের তিলাওয়াত, চিন্তা-ভাবনা এবং সে অনুযায়ী আমল করার ফলে ঈমানের উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ ঈমানের নূর ও আস্বাদ বৃদ্ধি পায়। ফলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ফরমাবরদারী সহজ হয়ে উঠে। ইবাদতে স্বাদ পায়, গুনাহের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা জন্মে ও কষ্টবোধ হয়।

হযরত আলী (রা) বলেন, ঈমান যখন অন্তরে প্রবেশ করে, তখন একটি নূরের শ্বেতবিন্দুর মত দেখায়। অতপর যতই ঈমানের উন্নতি হয়, সেই শ্বেতবিন্দু সম্প্রসারিত হয়ে উঠে। এমনকি শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর নূরে ভরপুর হয়ে যায়। তেমনি গুনাহ্ ও মুনাফিকীর ফলে প্রথমে অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। অতপর পাপাচার ও কুফরীর তীব্রতার সাথে সাথে সে কাল দাগটিও বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর কাল হয়ে যায়।---(মাযহারী) এজন্য সাহাবায়ে কিরাম একে অন্যকে বলতেন ঃ আস,

কিছুক্ষণ একত্রে বসি এবং দীন ও পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করি, যাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ বাক্যে মুনাফিকদের সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের কপটতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ প্রভৃতি অপরাধের পরিণতিতে প্রতি বছরই তারা কখনো একবার, কখনো দু'বার নানা ধরনের বিপদে পতিত হয়। যেমন, কখনো তাদের কাফির মিত্ররা পরাজিত হয়, কখনো তাদের গোপন অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে তারা দিবানিশি---মর্মপীড়া ভোগ করে। এখানে এক বা দু'বার বলতে কোন বিশেষ সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়, বরং বলা হচ্ছে যে, তাদের এই দুর্ভোগের পালা শেষ হওয়ার নয়। এ সত্ত্বেও কি তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

(১২৮) তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগী নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মানবকুল!) তোমাদের কাছে এমন এক রসূল আগমন করেছেন তোমাদের (নিজ সম্প্রদায়ের) মধ্য থেকেই (যাতে তোমাদের পক্ষে উপকার লাভ করা সহজ হয়)। তাঁর কাছেও তোমাদের দুঃখ-কষ্ট (বড়ই) দুঃসহ। (তোমরা কোনো ক্ষতির সম্মুখীন না হও তা-ই তাঁরও কাম্য।) যিনি তোমাদের কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত। (তবে বিশেষভাবে) মু'মিনদের প্রতি বড় স্নেহশীল (এবং) দয়াময়। (তাই এমন রসূল থেকে উপকৃত না হওয়া সত্যই দুর্ভাগ্যজনক।) এ সত্ত্বেও যদি তারা (আপনাকে স্বীকার করা কিংবা আপনার আনুগত্য থেকে) বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দিন, (আমার এতে কোন পরোয়া নেই) আমার জন্য (হিফাযতকর্তা ও সাহায্যকারী হিসাবে) আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত আর কেউ মা'বুদ হওয়ার যোগ্য নেই। (সুতরাং সমস্ত ইবাদত-বন্দেগী যখন একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য এবং তিনি যখন জ্ঞান ও শক্তিতে অদ্বিতীয়, তখন কারো

শত্রু তার পরোয়া নেই।) আমার ভরসা তাঁরই উপর। তিনি মহা আরশের অধিপতি। (সুতরাং সকল সৃষ্ট বস্তুরও যে তিনিই মালিক, তা বলাই বাহুল্য। অতএব তাঁর প্রতি ভরসা করার পর আমি আশঙ্কামুক্ত। কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করে তোমাদের ঠিকানা কোথায় হবে তাও একবার চিন্তা করে নাও।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ দু'টি আয়াত সূরা তওবার সর্বশেষ আয়াত। তাতে বলা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা) সকল সৃষ্টির উপর, বিশেষত মুসলমানদের উপর বড় দয়াবান ও স্নেহশীল। সর্বশেষ আয়াতে তাঁকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনার যাবতীয় চেষ্টা-তদবীরের পরও যদি কিছু লোক ঈমান গ্রহণে বিরত থাকে, তবে ধৈর্য ধরুন এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখুন।

সূরা তওবার শেষে একথা বলার সঙ্গত কারণ হলো এই যে, এর সর্বত্র রয়েছে কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও যুদ্ধ-জিহাদের বর্ণনা, যা আল্লাহ্‌র প্রতি আহবানের সর্বশেষ পন্থা রূপে বিবেচিত। আর এ পন্থা তখনই অবলম্বন করা হয়, যখন মৌখিক দাওয়াত ও ওয়াজ-তবলীগে হিদায়তের সকল আশা তিরোহিত হয়। তবে নবীগণের সমস্ত কাজ হলো স্নেহ-মমতা ও হামদর্দির সাথে আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে ডাকা, তাদের পক্ষ থেকে অবজ্ঞা ও যাতনার সম্মুখীন হলে তা আল্লাহ্‌র প্রতি সোপর্দ করা এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখা। এখানে 'আরশে আযীমের অধিপতি' বলার উদ্দেশ্য একথা বোঝানো যে, তাঁর অনন্ত কুদরত সমগ্র জগতের উপর পরিব্যাপ্ত। হযরত উবাই বিন কা'আব (রা)-এর মতে এ দু'টি আয়াত হলো কোরআন মজীদের সর্বশেষ আয়াত। এর পর আর কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। এ অবস্থায় নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকাল হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-ও এ মতই পোষণ করেন। —(কুরতুবী)

হাদীস শরীফে আয়াত দু'টির অনেক ফযীলত বর্ণিত আছে। হযরত আবুদ দারদা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা সাত বার করে আয়াত দু'টি পাঠ করবে, আল্লাহ্ পাক তার সমস্ত কাজ সহজ করে দেবেন।—(কুরতুবী) আল্লাহ্ মহান, পবিত্র, সর্বজ্ঞ।

ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم وفقنی لتکمیله کما
تحب وترضی والطف بنا فی تیسیر کل عسیر فان تیسیر کل عسیر علیک
یسیر ○

سورۃ یونس

সূরা ইউনুস

মক্কায় অবতীর্ণ॥ আয়াত সংখ্যা ১০৯॥ রুকূ সংখ্যা ১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝١ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ
اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ
قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ۝٢
اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ۭ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ۭ
ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝٣ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ۭ
وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۭ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ
وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝٤

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) الٓرٰ এগুলো হিকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত। (২) মানুষের কাছে কি আশ্চর্য লাগছে যে, আমি ওহী পাঠিয়েছি তাদেরই মধ্য থেকে একজনের কাছে যেন তিনি মানুষকে ভয়ের কথা শুনিয়ে দেন এবং সুসংবাদ শুনিয়ে দেন ঈমানদারকে যে, তাদের জন্য সত্য মর্যাদা রয়েছে তাদের পরওয়ারদিগারের কাছে। কাফিররা বলতে লাগল, নিঃসন্দেহে এ লোক প্রকাশ্য যাদুকর। (৩) নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ যিনি তৈরি করেছেন আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে, অতপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিচালনা করেন কাজের। কেউ সুপারিশ করতে পারবে না

তবে তাঁর অনুমতির পর। আল্লাহ্ হচ্ছেন তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তোমরা কি কিছুই চিন্তা কর না? (৪) তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য, তিনিই সৃষ্টি করেন প্রথমবার, পুনর্বার তৈরি করবেন তাদেরকে বদলা দেওয়ার জন্য, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে ইনসাফের সাথে। আর যারা কাফির হয়েছে, তাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করতে হবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব এ জন্য যে, তারা কুফরী করছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ-লাম-রা (এর অর্থ তো আল্লাহ্ই জানেন)। এগুলো (যা একটু পরেই পরিবেশিত হবে) হিকমতপূর্ণ কিতাবের (অর্থাৎ কোরআন মজীদের) আয়াত (যা সত্য হওয়ার কারণে জানবার এবং মানবার উপযুক্ত। আর যেহেতু এই কোরআন যাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর নবুয়তকে কাফিররা অস্বীকার করছিল তাই আল্লাহ্ পাক তাদেরই উত্তর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মক্কার) এসব লোকদের কি আশ্চর্য লেগেছে যে, আমি তাদেরই মধ্য থেকে (তাদেরই মতো) একজন মানুষের কাছে ওহী পাঠিয়েছি—(যার সারমর্ম হলো এই) যে, (সাধারণভাবে) তিনি সব মানুষকে (আল্লাহ্ পাকের হুকুম পালনের বরখেলাফ করার ব্যাপারে) ভীতি প্রদর্শন করবেন এবং যারা ঈমান আনবে তাদেরকে এই সুসংবাদ দেবেন যে, তারা তাদের পরওয়ারদিগারের কাছে (গিয়ে) পূর্ণ মর্যাদা পাবে। (অর্থাৎ এ ধরনের কোন বিষয় যদি ওহীর মাধ্যমে কোন মানুষের কাছে নাযিল হয়ে যায়, তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু) কাফিররা [এতে এতো বেশি আশ্চর্যান্বিত হয়েছে যে, হুযূরে পাক (সা) সম্পর্কে] বলতে আরম্ভ করেছে যে, (নাউযুবিল্লাহ) এ ব্যক্তি তো নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য যাদুকর (তিনি) নবী নন; কেননা নবুয়ত মানুষের জন্য হতে পারে না। (নিঃসন্দেহে) আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের (সত্যিকার) পালনকর্তা, যিনি সমস্ত আসমান ও যমীনকে (মাত্র) ছয় দিনে (সময়ে) তৈরি করেছেন। (এ থেকে বোঝা গেলো যে, আল্লাহ্ সর্বোচ্চ শক্তির অধিকারী।) অতপর আরশের উপর (যাকে রাজসিংহাসনের সাথে তুলনা করা যায় এমনভাবে) অধিষ্ঠিত হয়েছেন যেভাবে আরোহণ করা তাঁর শাসনের উপযুক্ত। যাতে করে সেই আরশ থেকে যমীন এবং আসমানে হুকুম জারি করতে পারেন। (যেমন একটু পরেই ইরশাদ করেছেন ঃ) তিনি প্রত্যেকটি বিষয়ের (উপযুক্ত) ব্যবস্থা করে থাকেন। (সুতরাং আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত জ্ঞানীও বটেন। তাঁর সামনে) তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন সুপারিশ-কারীর (সুপারিশ করার) ক্ষমতা নেই। (সুতরাং তিনি সুমহানও বটেন।) অতএব, এমন আল্লাহ্ই তোমাদের (প্রকৃত) পালনকর্তা। কাজেই তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত কর। (শিরক মোটেও করো না।) তোমরা কি (এতো প্রমাণাদি শোনার পরেও) বুঝতে পারছো না? তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্র কাছেই ফিরে যেতে হবে। (এ ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক সত্য ওয়াদা করে রেখেছেন।) নিশ্চয় তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করে থাকেন, (এবং কিয়ামতের সময়) তিনিই আবার পুনরুজ্জীবিত করবেন, যাতে করে যাঁরা ঈমান

এনেছে এবং ইন্‌সাফের সাথে সৎকাজও করেছে তাঁদেরকে (যথাযথ) প্রতিদান দেওয়া যায়। (তাতে যেন একটুও কমতি না হয়, বরং কিছু বেশি বেশিই দেওয়া যায়)। আর যারা (আল্লাহ্‌র সাথে) কুফরী করেছে তারা (আখিরাতে) পান করার জন্য পাবে ফুটন্ত পানি। আর (তাদের জন্য) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে; তাদেরই কুফরীর দরুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ইউনুস মক্কী সূরা। কেউ কেউ সূরার মাত্র তিনটি আয়াতকে মদনী বলে উল্লেখ করেছেন, যা মদীনায় হিজরত করার পর নাযিল হয়েছে। এই সূরার মধ্যেও কোরআন পাক এবং ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলী —তওহীদ, রিসালত, আখিরাত ইত্যাদি বিষয় বিশ্বচরাচর এবং তার মধ্যকার পরিবর্তন-পরিবর্ধনশীল ঘটনাবলীর মাধ্যমে প্রমাণ দেখিয়ে ভালো করে বোধগম্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাথে সাথে কিছু উপদেশমূলক, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং কাহিনীর অবতারণা করে সে সমস্ত লোকদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'আলার এসব প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহের উপর একটুও চিন্তা করে না। এতদসঙ্গে অংশীবাদের খণ্ডন এবং তৎসম্পর্কিত কিছু সন্দেহেরও উত্তর দেওয়া হয়েছে। এই সূরার সার বিষয়বস্তু তাই। এ সূরার বিষয়বস্তুর প্রতি নিবিড়ভাবে চিন্তা করলে পূর্ববর্তী সূরা তওবা আর এ সূরার মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে তাও সহজেই বোঝা যায়। সূরা তওবায় এসব উদ্দেশ্যাবলী (তওহীদ, রিসালত, আখিরাত ইত্যাদি) হাসিল করার জন্যই অবিশ্বাসী কাফিরদের সাথে জিহাদ করা এবং কুফর ও শিরকের শক্তিকে সাধারণ উপকরণের মাধ্যমে পরাস্ত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ সূরা যেহেতু জিহাদের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাই উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলীকে মক্কী যিন্দেগীর রীতি অনুযায়ী শুধু দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। الٓر এগুলোকে হরফে 'মুকাততাআহ্' বলা হয়, যা কোরআন মজীদের অনেক সূরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, الٓمٓ، عٓسٓقٓ، قٓ، حمٓ ইত্যাদি। এ সমস্ত শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তফসীরকারগণ অনেক কিছু লিখেছেন। এ ধরনের সমস্ত হরুফে মুকাততাআহ্ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন এবং অধিকাংশ বুযুর্গানে কিরামের অভিমত হলো এই যে, এগুলো বিশেষ কিছু গুপ্ত কথা, যার অর্থ হয়তো বা হুযূর (সা)-কে বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সাধারণ উম্মতকে শুধু সে সমস্ত জ্ঞান জ্ঞাতব্য সম্বন্ধেই অবহিত করেছেন, যা তারা সহ্য করতে পারবে এবং যা না হলে তাদের কাজকর্মে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারত। আর হরুফে মুকাততাআহ্‌র গূঢ় তত্ত্ব এমন কোন জ্ঞাতব্য বিষয় নয় যে, তা না জানলে উম্মতের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে কিংবা এমনও নয় যে, এগুলোর তত্ত্বকথা না জানলে উম্মতের কোন ক্ষতি হতে পারে। এ জন্যই হুযূর (সা)-ও এগুলোর অর্থ উম্মতের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করে বর্ণনা করে যাননি। অতএব আমাদের পক্ষেও

এগুলোর অর্থ বের করার পেছনে সময় ব্যয় করা উচিত হবে না। কারণ, এটা তো সত্য কথা যে, এ সব শব্দের অর্থ জানার মধ্যে যদি আমাদের কোন রকম মঙ্গল নিহিত থাকত, তাহলে রহমতে-আলম (সা) অন্তত এগুলোর অর্থ বিশ্লেষণে কোন রকম কার্পণ্য করতেন না।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ বাক্যে تلك শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে এ সূরার সে সমস্ত আয়াতের প্রতি, যা একটু পরেই পরিবেশিত হতে যাচ্ছে। আর কিতাব অর্থ এখানে কোরআন। এর প্রশংসা এখানে শব্দ দ্বারা করা হয়েছে, যার অর্থ হল হিকমতপূর্ণ কিতাব।

দ্বিতীয় আয়াতে রয়েছে মুশরিকদের একটি সন্দেহ ও প্রশ্নের উত্তর। সন্দেহটি ছিলো এই যে, কাফিররা তাদের মূর্খতার দরুন সাব্যস্ত করে রেখেছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যে নবী বা রসূল আসবেন তিনি মানুষ হবেন না বরং তিনি মানুষ না হয়ে ফেরেশতা হওয়াটাই উচিত। কোরআন পাক বিভিন্ন জায়গায় তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার উত্তর বিভিন্ন প্রকারে দিয়েছে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ فِى السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا - অর্থাৎ যমীনের উপর যদি ফেরেশতারা বাস করতো, তাহলে আমি তাদের জন্য কোন ফেরেশতাকেই রসূল বানিয়ে পাঠাতাম। যার মূল কথা হলো এই যে, রিসালতের উদ্দেশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রসূল এবং যাদের মধ্যে রসূল পাঠানো হচ্ছে এই দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। বস্তুত ফেরেশতার সম্পর্ক থাকে ফেরেশতাদের সাথে আর মানুষের সম্পর্ক থাকে মানুষের সাথে। যখন মানুষের জন্য রসূল পাঠানোটাই উদ্দেশ্য, তখন কোন মানুষকেই রসূল বানানো উচিত।

এই আয়াতে এ বিষয়টিই অন্যভাবে বলা হয়েছে যে, এ কারণে এসব লোকের বিস্মিত হওয়া যে, মানুষকে কেন রসূল বানানো হলো এবং সে মানুষকেই বা কেন নাফরমান ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্র আযাবের ভীতি প্রদর্শন করার জন্য এবং যারা আল্লাহ্র ফরমাবরদার তাদেরকে সওয়াবের সুসংবাদ শুনিয়ে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হলো? এই বিস্ময় প্রকাশ্যই একটা বিস্ময়ের বিষয়। কারণ, মানুষের কাছে মানুষকে রসূল করে পাঠানোই তো বুদ্ধিমত্তার কাজ। আশ্চর্য হওয়ার কারণ তখনই হতো যদি মানুষের কাছে মানুষ না পাঠিয়ে ফেরেশতা বা অন্য কাউকে পাঠানো হতো।

এ আয়াতে ঈমানদারদেরকে أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ শব্দের দ্বারা সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে قَدَمٌ অর্থ পা। যেহেতু পা'ই মানুষের চেষ্টা-তদবীর এবং উন্নতির চাবিকাঠি হয়ে থাকে, সেহেতু ভাবার্থ হিসাবে উচ্চমর্যাদাকে আরবীতে 'কদম' (পদমর্যাদা) বলে দেওয়া হয়। আর 'সত্যের পা' বলে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, এই উচ্চমর্যাদা যা তাঁরা পাবে তা সত্য ও সুনিশ্চিত এবং তা চিরকাল থাকার মতো প্রতিষ্ঠিতও বটে। পৃথিবীর পদমর্যাদার মতো নয় যে, কোন কাজের বিনিময়ে প্রথমত সে সম্মান পাবার কোন নিশ্চয়তাই থাকে না, আর যদিও বা পাওয়া যায় তবুও তা চিরকাল থাকার কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং সেই সম্মান বা পদমর্যাদা শেষ হয়ে গিয়ে ধূলোয় মিশে যাওয়াটাই বেশি বিশ্বাসযোগ্য। অনেক সময় দেখা যায়, তার জীবিত অবস্থায়ই তা শেষ হয়ে যায়, আর মৃত্যুর সময় তো পৃথিবীর সমস্ত পদমর্যাদা এবং ধন-সম্পদ থেকে মানুষ খালি হাত হয়ে যায়ই। মোটকথা, صِدْقٍ শব্দ ব্যবহার করে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, আখিরাতের পদমর্যাদা যেমন সত্য, সঠিক, তেমনি পরিপূর্ণ এবং চিরস্থায়ীও বটে। অতএব, বাক্যের অর্থ দাঁড়ালো এই যে, ঈমানদারদেরকে এ সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাঁদের জন্য তাঁদের পালনকর্তার কাছে অনেক বড় সম্মানিত মর্যাদা রয়েছে যা তাঁরা নিশ্চিতই পাবে এবং পাওয়ার পর কখনো তা শেষ হয়ে যাবে না (অর্থাৎ চিরকালই তারা সেই সম্মানিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবে)। কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, এক্ষেত্রে صِدْقٍ শব্দ প্রয়োগের মাঝে এমন ইশারাও করা উদ্দেশ্য যে, বেহেশতের এসব উচ্চমর্যাদা একমাত্র সত্যনিষ্ঠা ও ইখলাসের কারণেই পেয়ে থাকবে, শুধু মুখের জমাখরচ এবং মুখে কলেমায়ে ঈমান পড়ে নিলেই যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না মুখ এবং অন্তর উভয়টি দিয়েই নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনবে, যার অনিবার্য ফলাফল হলো নেক কাজের উপর পাবন্দী করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা।

তৃতীয় আয়াতে তওহীদকে এমন অনস্বীকার্য বাস্তবতার দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করার মধ্যে অতপর সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনার মধ্যে যখন আল্লাহ্ তা'আলার কোন শরীক-অংশীদার নেই, তখন ইবাদত-বন্দেগী এবং হুকুম পালনের ক্ষেত্রে অন্য কেউ কি করে শরীক হতে পারে? বরং এতে (ইবাদতে) অন্য কাউকে শরীক করা একান্তই অবিচার এবং সীমালঙ্ঘনের শামিল। এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আসমান ও যমীনকে (আল্লাহ্ পাক) মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমাদের পরিভাষায় সময়ের সে পরিমাণকেই দিন বলা হয়, যা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সীমিত। আর এটা প্রকাশ্য যে, আসমান-যমীন ও তারকা-নক্ষত্রের সৃষ্টির পূর্বে সূর্যের কোন অস্তিত্বই ছিল না। তাহলে সূর্য উঠা এবং সূর্য ডুবার হিসাব কি করে হবে? কাজেই (দিন বলতে) এখানে ঐ পরিমাণ সময় উদ্দেশ্য যা এই পৃথিবীতে সূর্য ওঠা এবং ডুবার মাঝখানে হয়ে থাকে।

এই ছয় দিনের সামান্য সময়ে এতো বড় বিশ্ব যা আসমান, যমীন, তারা এবং এই বিশ্বে যত কিছু আছে সমস্তকে তৈরি করে দেওয়া একমাত্র পবিত্র 'যাতে-খোদাওয়ান্দী'র পক্ষেই সম্ভব ছিল, যিনি সমস্ত কিছুর উপরে কুদরত রাখেন। তাঁর সৃষ্টিকার্যের জন্য না আগে থেকে কোন উপকরণের প্রয়োজন, না কোন কারিগর বা খাদেমের প্রয়োজন। বরং আল্লাহ্ পাকের পরিপূর্ণ কুদরতের এমনই শান যে, যখনই তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন কোন বস্তু বা কারো সাহায্য ছাড়াই এক মুহূর্তে তৈরি করে ফেলেন। এই ছয় দিনের অবকাশও হয়ত কোন বিশেষ হিকমত এবং মঙ্গলের জন্যই গ্রহণ করা হয়েছিল। না হয় তিনি এই আসমান, যমীন এবং বিশ্বের সমস্ত কিছু এক মুহূর্তে তৈরি করে দিতে পারতেন। তারপর বলেছেন ঃ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ

অর্থাৎ আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কোরআন এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ পাকের আরশ এমন এক সৃষ্টি যা সমস্ত আসমান, যমীন এবং সমগ্র বিশ্ব-জাহানকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। গোটা বিশ্ব তারই বেষ্টনীর মধ্যে আবর্তিত।

এ বিষয়ে এর চাইতে বেশি কিছু তাৎপর্য জানা মানুষের ক্ষমতার মধ্যে নেই। যে মানুষ নিজেদের বিজ্ঞানের চরম উন্নতি-উৎকর্ষের যুগেও শুধুমাত্র অতি নিম্নে অবস্থিত তারকাপুঞ্জে পৌঁছার প্রস্তুতি পর্বেই পরিব্যাপ্ত এবং আজো পর্যন্ত তাও সম্ভব হয়নি বরং তাঁরা অকপটে স্বীকার করেছেন যে, তারাগুলো আমাদের থেকে এতো দূরে অবস্থিত যে, দূরবীক্ষণ দ্বারাও এগুলো সম্বন্ধে যা জানা যায়, তাও অনুমান-আন্দাজের অতিরিক্ত কিছুই নয়। তাছাড়া অনেক তারকা এমনও রয়েছে, যার আলোকরশ্মি এখনো পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়নি। অথচ আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে লক্ষাধিক মাইল বলে বলা হয়ে থাকে। যখন তারাদের পর্যন্ত পৌঁছার ব্যাপারে মানুষের এ অবস্থা, তখন সে আসমান সম্পর্কে যা এই তারাদের থেকেও অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত এই দুর্বল মানুষ কি জানতে পারে? আর যে আরশ সাত আসমান থেকেও অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত এবং গোটা বিশ্বকে ঘিরে রেখেছে তার অবস্থা এ মানুষ কি করে জানবে? আলোচ্য আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ পাক (মাত্র) ছয় দিন সময়ের মধ্যে আসমান-যমীন এবং গোটা সৃষ্টজগত তৈরী করেছেন এবং আরশে (পাকে) অধিষ্ঠিত হয়েছে। একথা সত্য-সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ পাক শরীর বা শরীরী বস্তু কিংবা তার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য থেকে অনেক অনেক উর্ধ্বে। তাঁর অস্তিত্ব না কোন বিশেষ দিগ্বলয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত, না কোন জায়গার সাথে যুক্ত। তাঁর অধিষ্ঠান পৃথিবীর বস্তুনিচয়ের অধিষ্ঠানের মত নয়, যা তাদের আপন আপন জায়গায় অধিষ্ঠিত হয়ে থাকে। সুতরাং প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে আরশের উপর আল্লাহ্র অধিষ্ঠিত হওয়াটা কি ধরনের এবং কোন্ প্রকারের? এটা এমন একটা জটিল প্রশ্ন যে, মানুষের সীমিত জ্ঞানবুদ্ধির পক্ষে এর সমাধান পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। এ জন্যই এ সমস্ত ব্যাপারে কোরআন পাকের ইরশাদ হচ্ছে এই যে ঃ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗ اِلَّا اللّٰهُ وَالرّٰسِخُوْنَ

فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ اٰمَنَّا بِهٖ অর্থাৎ এগুলো সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ পাক ছাড়া আর কেউ জানে না। বস্তুত যারা প্রগাঢ় এবং সঠিক জ্ঞানের অধিকারী তারা এ সমস্ত ব্যাপারে ঈমান আনার কথা স্বীকার করে। কখনো এগুলোর তত্ত্ব-রহস্য নিয়ে মাথা ঘামায় না।

সুতরাং এ ধরনের সমস্ত বিষয়ে যেখানে আল্লাহ্ পাকের সম্পর্কে কোন জায়গা বা কোন বিশেষ দিকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অথবা যেখানে আল্লাহ্ পাকের অংগ বিশেষের কথা যেমন ঃ হাত-পা, মুখমণ্ডল প্রভৃতি শব্দ কোরআন পাকে নাযিল হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে অধিকাংশ আলিম সমাজের অভিমত হলো এই যে, এগুলোর উপর যথাযথ ঈমান আনা কর্তব্য যে, এ সমস্ত শব্দ যথাস্থানে ঠিক আছে। আর এ সমস্ত শব্দের দ্বারা আল্লাহ্ পাকের যা উদ্দেশ্য তাও শুদ্ধ। পক্ষান্তরে যেহেতু এগুলো নিজেদের সীমিত জ্ঞানের অনেক উর্ধ্বে, তাই এগুলোর প্রকার ও তত্ত্ব সম্পর্কে জানার চিন্তা ত্যাগ করাই উত্তম। যেমন, কোন কবি বলেছেন ঃ

نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن
کہ جاہا سپر باید انداختن

'সব সওয়ারী প্রত্যেক জায়গায় সমান চলতে পারে না।' পরবর্তী সময়ের যেসব আলিম এসব বাক্যের কোন অর্থ করেছেন বা বলেছেন তাঁরাও সেসব অর্থ শুধুমাত্র একটা সম্ভাবনার পর্যায়ে বলে উল্লেখ করেছেন যে, 'সম্ভবত এর অর্থ এই'। এ সমস্তের অর্থ তারা কখনো 'এটাই হবে' এভাবে নির্দিষ্ট করে বলেন নি। আর শুধু সম্ভাবনা কখনো তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে না। অতএব, সোজা-সরল পথ হবে সেটিই যা সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন এবং সলফে-সালেহীন বলেছেন। তাঁরা এ সমস্ত বিষয়ের তাৎপর্য 'আল্লাহই ভালো জানেন' বলে ছেড়ে দিয়েছেন।

তারপর বলেছেন يُدَبِّرُ الْاَمْرَ অর্থাৎ আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আল্লাহ্ পাক সমস্ত জাহানের এন্তেযাম বা ব্যবস্থাপনা স্বয়ং নিজের কুদরতের হাতে সম্পাদন করেছেন।

مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهٖ অর্থাৎ কোন নবী-রসূলেরও আল্লাহ্ পাকের দরবারে নিজ ইচ্ছানুযায়ী সুপারিশ করার ক্ষমতা নেই ; যতক্ষণ না আল্লাহ্ পাকের কাছ থেকে সুপারিশ করার অনুমতি লাভ করবেন, তারাও কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবেন না। চতুর্থ আয়াতে আখিরাতের বিশ্বাস সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا অর্থাৎ তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে।

إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا এটা আল্লাহ্‌র সত্য এবং সঠিক ওয়াদা

অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টজগতকে প্রথমবারও তিনি তৈরী করেছেন এবং কিয়ামতের সময় তিনিই আবার পুনরুজ্জীবিত করবেন। এ বাক্যে বলে দেয়া হয়েছে যে, এ ব্যাপারে বিস্মিত হবার কিছুই নেই যে, এই গোটা সৃষ্টজগত ধ্বংস হয়ে যাবার পর আবার কেমন করে পুনরুজ্জীবিত হবে? কেননা যে পবিত্র সত্তা কোন নমুনা বা উপকরণ ছাড়াই প্রথমবার কোন বস্তু তৈরী করার ক্ষমতা রাখেন, তাঁর পক্ষে একবার তৈরী করা বস্তুকে ধ্বংস করে দিয়ে আবার পুনরুজ্জীবিত করা এমন কি কঠিন ব্যাপার?

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ۝

(৫) তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে চমকদার, আর চন্দ্রকে আলো হিসেবে এবং অতপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্য মনযিলসমূহ, যাতে করে তোমরা চিনতে পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। আল্লাহ্ পাক এই সমস্ত কিছু এমনিই বানিয়ে দেননি—কিন্তু তদবীরের সাথে। তিনি প্রকাশ করেন লক্ষণসমূহ সেই সমস্ত লোকের জন্য যাদের জ্ঞান আছে। (৬) নিশ্চয়ই রাত-দিনের পরিবর্তনের মাঝে এবং যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীনে, সবই হল নিদর্শন সেসব লোকের জন্য যারা ভয় করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সেই আল্লাহ্ এমন, যিনি সূর্যকে করেছেন দীপ্তিমান আর চাঁদকে করেছেন আলোময়, আর তার (চলার) জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন মনযিলসমূহ, (সে প্রতিদিন এক মনযিল করে অতিক্রম করে থাকে।) যাতে করে (এই সমস্ত গ্রহাবর্তের মাধ্যমে) তোমরা বছরগুলোর গণনা ও হিসাব জেনে নিতে পার। আল্লাহ্ তা'আলা এ সমস্ত জিনিস অমূলক সৃষ্টি করেননি। তিনি এ সব প্রমাণ সেসব লোককে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যারা জ্ঞান রাখে) নিঃসন্দেহে রাত এবং দিনের ক্রমাগমনের মাঝে এবং

যা কিছু আল্লাহ (পাক) আসমান ও যমীনে সৃষ্টি করেছেন, সেসবের মধ্যে (তওহীদের) প্রমাণাদি রয়েছে সেসব লোকের জন্য, যারা (আল্লাহ্‌র) ভয় মানে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ তিনটি আয়াতে সমগ্র সৃষ্টজগতের বহু নিদর্শন উল্লিখিত হয়েছে, যা আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর পূর্ণ কুদরত ও পরিপূর্ণ হিকমতের স্বাক্ষর বহন করে এবং এ দাবির প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, আল্লাহ পাক বিশ্বকে ধ্বংস করে গুড়িয়ে দিতে সক্ষম এবং পরে পুনরায় সেই কণাসমূহকে একত্রিত করে একেবারে নতুন অবস্থায় জীবিত করে হিসাব-নিকাশের পর পুরস্কার কিংবা শাস্তির আইন জারি করবেন; আর এটাই বিবেক ও জ্ঞানের চাহিদা।

এভাবে এই তিনটি আয়াত ঐ সংক্ষেপের বিশ্লেষণ, যা পূর্ববর্তী তিনটি আয়াতে আসমান-যমীনকে ছয় দিনে তৈরী করা অতপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার পর يُدَبِّرُ الْأَمْرَ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয় যে, তিনি শুধু এই বিশ্বকে তৈরী করেই ক্ষান্ত হননি, প্রতিমুহূর্তে প্রত্যেক জিনিসের পরিচালনা এবং শাসনব্যবস্থাও তাঁর হাতেই রয়েছে।

এই ব্যবস্থা ও পরিচালনার একটি অংশ হলো هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُورًا এখানে ضيا এবং نور উভয়টির অর্থই জ্যোতি ও ঔজ্জ্বল্য। সেজন্যই অভিধানের অনেক ইমাম এ দু'টি শব্দকে একই অর্থবোধক শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আল্লামা যামাখ্‌শারী এবং তায়েবী প্রমুখ বলেছেন যে, যদিও উভয় শব্দের মাঝেই জ্যোতি অর্থ বিদ্যমান, তথাপি نور শব্দটি ব্যাপক। দুর্বল-সবল, ক্ষীণ-তীক্ষ্ণ যে কোন জ্যোতিকেই নূর বলা যায়। কিন্তু ضوء এবং ضياء যে আলোতে তীক্ষ্ণতা বিদ্যমান শুধু তাকেই বলা হয়। আর মানুষের উভয় রকমের আলোরই প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণ কাজকর্মের জন্য দিনের প্রখর আলোর প্রয়োজন, আর ছোট ছোট কাজের জন্য রাতের ক্ষীণ আলোই বেশী পছন্দনীয়। যদি দিনের বেলায়ও শুধু চাঁদের অনুজ্জ্বল আলোই থাকতো, তাহলে কাজ-কর্মে অসুবিধার সৃষ্টি হতো। পক্ষান্তরে যদি রাতেও সূর্যের তীক্ষ্ণ আলো থাকতো, তাহলে ঘুম এবং রাতের উপযুক্ত কাজে অসুবিধা হতো। কাজেই আল্লাহ্ পাক দু'ধরনের আলোর ব্যবস্থাই এমনভাবে করেছেন যে, সূর্যের আলোকে ضو (যাও) এবং ضيا (যিয়া)-এর পর্যায়ে রেখেছেন। কাজ-কর্মের সময়ে তারই বিকাশের ব্যবস্থা করেছেন। আর চাঁদকে হালকা এবং মৃদু আলো

দিয়ে বানিয়েছেন এবং রাতে তার প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। সূর্য এবং চাঁদের আলোর পার্থক্যের কথা কোরআন একাধিক জায়গায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে।

সূরা নূহে বলা হয়েছে ঃ-وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا

সূরা ফুরকানে বলেছেন ঃ -وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيرًا 'সেরাজ' শব্দের অর্থ চেরাগ (অর্থাৎ প্রদীপ)। যেহেতু প্রদীপের আলো তার নিজস্ব আলো, অন্য কারো কাছ থেকে ধার করা নয়, সেহেতু কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন যে, কোন বস্তুর নিজস্ব আলোকে ضيا বলা হয়। আর نور বলা হয় সে সমস্ত আলোকে যা অন্য কারো থেকে অর্জন করে আলোকিত হয়। কিন্তু এ মতের পেছনে গ্রীক দর্শনের প্রভাব বিদ্যমান। অন্যথায় এর কোন আভিধানিক ভিত্তি নেই। আর স্বয়ং কোরআন করীমও এর কোন শেষ সমাধান দেয়নি।

মুফাস্সির যুজ্জাজ ضياء শব্দকে ضوء শব্দের বহুবচন বলেছেন। এই প্রেক্ষিতে হয়তো এখানে একথা বোঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যে, আলোর সাতটি প্রসিদ্ধ রং এবং অন্যান্য যত রং পৃথিবীতে পাওয়া যায় সূর্যই হলো সেগুলোর উৎস, যা বৃষ্টির পর রংধনুর মধ্যে প্রকাশ পায়।—(মানার)

সূর্য ও চন্দ্রের পরিচালনা ব্যবস্থার মাঝে স্রষ্টার মহান নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে ঃ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

قدر শব্দটি تقدير শব্দ থেকে ঘটিত تقدير অর্থ হল কোন বস্তুকে স্থান কাল অথবা গুণাবলী অনুযায়ী একটা বিশেষ পরিমাণের উপর স্থাপন করা। রাত এবং দিনের সময়কে একটা বিশেষ পরিমাণের উপর রাখার জন্য কোরআন করীমে বলা হয়েছে ঃ—وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ জায়গার দূরত্বকে একটা বিশেষ পরিমাপ মত রাখার জন্য অন্য জায়গায় শাম দেশ ও সাবার মধ্যবর্তী বস্তিসমূহ সম্পর্কে বলেছে ঃ —وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ আর সাধারণ পরিমাণ সম্পর্কে বলেছে।

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا

منازل শব্দটি منزل-এর বহুবচন। এর প্রকৃত অর্থ নাযিল হওয়ার জায়গা।

আল্লাহ্ পাক চন্দ্র-সূর্য উভয়ের চলার জন্য বিশেষ সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যার

প্রত্যেকটিকেই একেক منزل বলা হয়। চাঁদ যেহেতু প্রতিমাসে তার নিজস্ব পরিক্রমণ সমাপ্ত করে ফেলে, সেহেতু তার মনযিল হল ত্রিশ অথবা উনত্রিশটি। অথবা যেহেতু চাঁদ প্রতি মাসে কমপক্ষে একদিন লুকায়িত থাকে সেজন্যে সাধারণত চাঁদের মনযিল আটাশটি বলা হয়। আর সূর্যের পরিক্রমণ বছরান্তে পূর্ণ হয় বলে তার মনযিল হল তিনশ' ষাট অথবা পঁয়ষট্টি। আরবের প্রাচীন জাহিলিয়াত যুগে এবং জ্যোতির্বিদদের মতেও এই মনযিলগুলোর বিশেষ বিশেষ নাম সেসব নক্ষত্রের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছে, যেগুলো সেসব মনযিলের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। কোরআন করীম এ সমস্ত প্রচলিত নামের বহু উর্ধ্বে। বস্তুত কোরআনের উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র ঐটুকু দূরত্ব বোঝানো, যা চন্দ্র-সূর্য বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে অতিক্রম করে থাকে।

উপরোল্লিখিত আয়াতে قَدَّرَهُ مَنَازِلَ একবচনের ضمير (সর্বনাম) ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ মনযিল কিন্তু চন্দ্র-সূর্য উভয়েরই। কাজেই কোন কোন মুফাস্‌সির বলেছেন, যদিও এখানে একবচনের সর্বনাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকটি একক হিসেবে উভয়টি বোঝানোই উদ্দেশ্য, যার দৃষ্টান্ত কোরআন এবং আরবী পরিভাষায় অনেক অনেক পাওয়া যায়।

আবার কোন কোন মুফাস্‌সির বলেছেন ঃ যদিও আল্লাহ্ পাক চন্দ্র-সূর্য উভয়ের জন্য মনযিলসমূহ কায়েম রেখেছেন, কিন্তু এখানে চাঁদের মনযিল বোঝানোই উদ্দেশ্য। অতএব قَدَّرَهُ শব্দের সর্বনাম চাঁদের সাথেই সম্পৃক্ত। একটির সংগে খাস করার কারণ হলো এই যে, সূর্যের মনযিল দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং হিসাব ছাড়া জানা যায় না। সূর্যের উদয়াস্ত বছরের প্রতিদিন একই অবস্থানে হয়ে থাকে। শুধু চোখে দেখে একথা বোঝা যাবে না যে, আজ সূর্য কোন্ মনযিলে অবস্থিত। কিন্তু চাঁদের অবস্থা অন্য রকম। তার অবস্থা প্রতিদিন বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। মাসের শেষের দিকে তো চাঁদ মোটেই দেখা যায় না। এ ধরনের পরিবর্তন দেখে একজন বিদ্যাহীন লোকও চাঁদের তারিখগুলো বলে দিতে পারে। উদাহরণত যদি ধরা যায়, আজ মার্চ মাসের আট তারিখ, তবে কোন মানুষই সূর্য দেখে এ কথা বুঝতে পারবে না যে, আজ আট তারিখ কি একুশ তারিখ। কিন্তু চাঁদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা---চাঁদকে দেখেও তার তারিখটা বলে দেয়া যেতে পারে।

উল্লিখিত আয়াতে যেহেতু এ কথা বলাই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলার এ সমস্ত মহান নির্দেশের সাথে মানুষের এসব উপকারিতাও সম্পর্কযুক্ত যে, তারা এগুলোর মাধ্যমে বছর, মাস এবং এর তারিখের হিসাব জানবে। বস্তুত এ হিসাব যদিও চন্দ্র-সূর্য উভয়টির দ্বারাই জানা যেতে পারে এবং পৃথিবীতে চান্দ্র ও সৌর উভয় প্রকার বর্ষ-মাসই প্রাচীনকাল থেকে পরিচিতও রয়েছে এবং স্বয়ং কোরআন মজীদেও সূরা 'ইস্‌রা'-এর দ্বাদশতম আয়াতে তা বলেছে ঃ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ-